গঙ্গাবতরণ

শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়



রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড কলিকাতা-৩৭

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৬২

প্রকাশক
শ্রীসজনীকান্ত দাস
রঞ্জন পাবলিশিং হাউস

প্রচ্ছদপট
শিল্পী গোপাল ঘোষ

আলোকচিত্র
লেখক

ব্লক-তৈরী, বাঁধানো
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ, কলিকাতা

মুদ্রাকর
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
৩২ আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা ৯

চিত্রসূচী

১

১৯৫২ সাল। মে মাস।

আবার কেদার-বদরী-যাত্রার উদ্যোগ করছি।

কিছুদিন আগে ভাইপো বিলেত থেকে ফিরেছে। বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞান-বিষয়ে গবেষণা করছে। সব কিছু নিজের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে দেখে, যার প্রমাণ পায় না তা মান্‌তে চায় না।

আমার যাওয়ার খবর শুনে বলে, আবার কেদার-বদরী চল্‌লে কেন? একবার ত ঘুরে এসেছ। যাও না, ইউরোপ দেখে এস। ও-দিকে ত কখনো যাও-ই নি। অনেক কিছু নতুন দেখ্‌বে। আর যদি পাহাড়েই বেড়াতে চাও—চলে যাও সুইজারল্যাণ্ডে। কী অপূর্ব

দেশ! পাহাড় পাবে, স্নো পাবে, লেক্ পাবে। যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, তেম্‌নি ট্যুরিষ্ট-দের থাকবার সুবন্দোবস্ত। পায়ে হাঁটার কষ্ট নেই, চটিতে থাকার অসুবিধে নেই। সব কিছুই হাতের কাছে পাবে, এমন কি পাহাড়ের বরফ-ঢাকা চূড়ায় পর্য্যন্ত ট্রেনে করে পৌঁছে দেবে!

চুপ্ করে শুনি, আর হাসি।

তারপরে বলি, হাঁ—তাইত গল্প শুনি, বই-এ পড়ি, ছবিও দেখি। পাস্-পোর্টও ত করা আছে। কিন্তু, তবুও যাওয়া হচ্ছে কই? যখনি সুযোগ আসে তখনি হিমালয়ের দিকেই মন ছোটে,—বার হয়ে পড়ি। যেতেই হয়।

ভাইপোও হাসে। বলে, আশ্চর্য্য! তোমাদের এ-সব বুঝি না কিছু। বুঝেও কাজ নেই আমার!

তারপর, একাই যাত্রা করি। যাত্রা সাঙ্গ করে ফিরেও আসি—পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি নিয়ে।

২

বছর ঘুরে যায়। আবার মে মাস আসে।

হিমালয়ের দুর্নিবার আকর্ষণ ঘর-ছাড়া মনকে আবার পথে টানে। যাত্রার আয়োজন করি।

ভাইপো খবর শুনে কাছে এসে দাঁড়ায়। হাসে। বলে, পাগল হলে নাকি? আবার চলেছ কেদার-বদরী? এইত সেদিন ঘুরে এলে?

তারপর, আবার পশ্চিম-যাত্রার পরামর্শ দেয়, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রোজ্জ্বল প্রগতির পরিচয় দেয়। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করে, আচ্ছা—সত্যি বলো ত ওখানে বারবার গিয়ে কি কোন আনন্দ পাও?

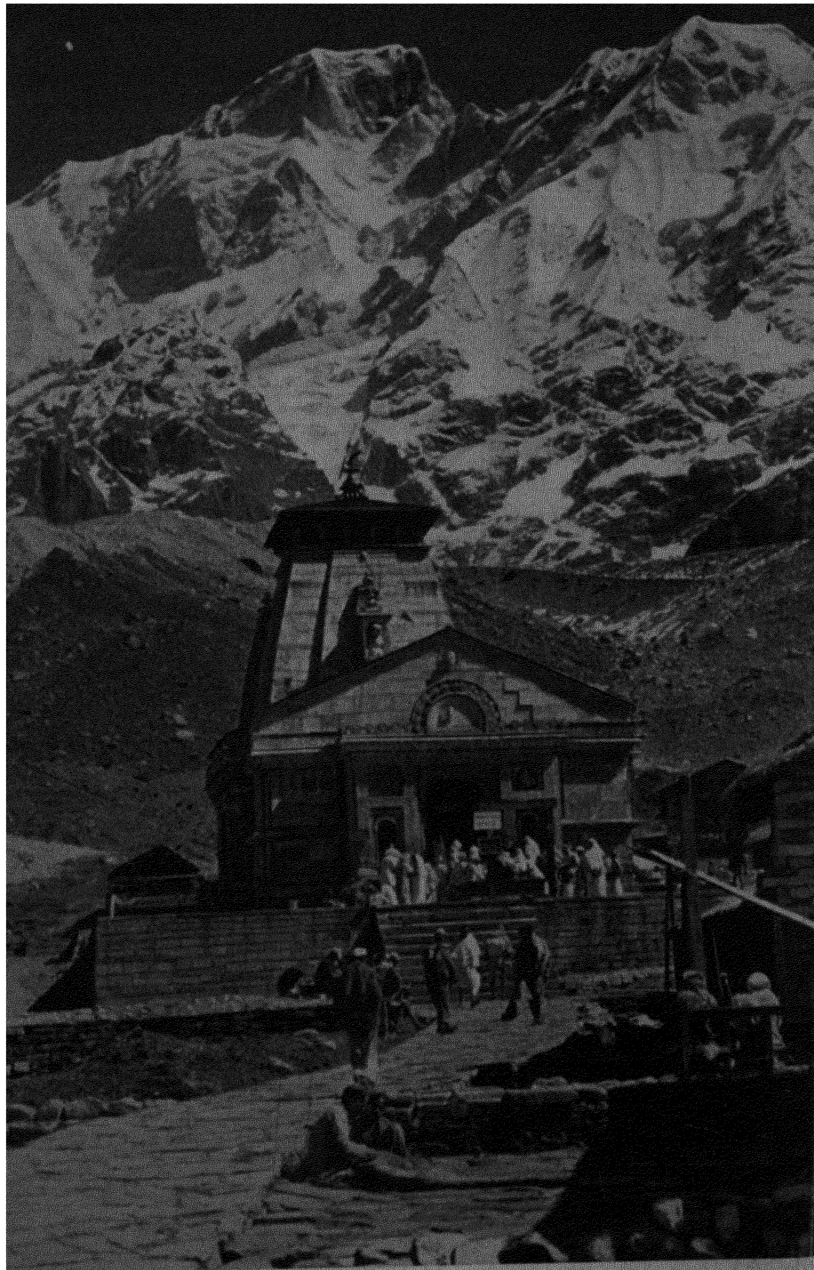
উত্তর দিই, পাই বই কি। নিশ্চয় পাই এবং আশাতীত পাই। নইলে যাবোই বা কেন? কেউ ত এখান থেকে জোর করে পাঠায় না। তবে, কেন যে যাই, কি যে পাই —বোঝাতে পারি না।

ভাইপো গম্ভীর হয়েই বলে, চলো, এবার আমিও যাবো তোমার সঙ্গে। একবার দেখে আসি, কি আছে ওখানে। পারবো না যেতে?—শুনেছি নাকি খুব কষ্টকর পথ?

যে-কেউ আসে কেদার-বদরী-যাত্রার পরামর্শ নিতে, নিঃসঙ্কোচে যেতে উৎসাহ দিই। বলি, দ্বিধা না করে বেরিয়ে পড়ুন। কোনও ভয় নেই। সুবিধে-অসুবিধের, বাধা-বিপত্তির হিসেব-নিকেশ করতে যাবেন না, করলেই হিসেবে মিলবে না, যোগে ভুল হবে—যাওয়ায় বাধা ঘটাবে। বা'র হয়ে পড়লেই দেখবেন, ঠিক ঘুরে এসেছেন।

ভাইপোর বেলায় কিন্তু বলতে দ্বিধা জাগে। ভাবি, সত্যিইত পথের অত অসুবিধা, গৃহ-সুখের সন্ধান নেই—যদি কোন ক্লেশ বোধ করে!

তবুও বলি, বেশ ত চলো না, হাজার-হাজার লোক চলেছে, আর তুমি পারবে না? নিশ্চয় পারবে। তবে, পথের কষ্টটুকু স্বীকার করে নিও। চোখ ও মন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রেখো—অপার আনন্দ পাবে।



কেদারনাথ

দুজনে বেরিয়ে পড়ি

হিমালয়ে পথ-চলার অভিনব জীবন তার সুরু হয়। চারিদিকের বিচিত্র আবেষ্টনীর সঙ্গে সে নিজেকে সুন্দর-ভাবে মানিয়ে নেয়। দুর্গম পথের দুরূহতাও হাসিমুখে বরণ করে।

পথ চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করি, সামনের চড়াইটা ওঠবার জন্যে একটা ডান্ডী বা ঘোড়া করব নাকি?

সে তখনি প্রতিবাদ জানায়। বলে, না, নাঃ—চমৎকার চলেছি। ধীরে ধীরে ঠিক উঠে যাবো। বেশ লাগ্‌ছে।

বৈজ্ঞানিক গবেষক মন তার সজাগ আছে। অনুসন্ধিৎসার অনুবীক্ষণে সব কিছু দেখবার জানবার চেষ্টা করে।

কেদারনাথে এসে পেঁছুলাম। সাগরবক্ষ থেকে ১১,৭৫০ ফিট্। তুষারমৌলী কেদারশৃঙ্গের পাদদেশে অপরূপ মন্দির। মন্দিরের পিছনে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। কিছুকাল আগেও বরফে ঢাকা ছিল। এখন চারিদিকে তুষার-গলা জলের ধারা নেমেছে—অদূরবর্ত্তিনী

মন্দাকিনীর সঙ্গে কলোচ্ছ্বাসে মিলতে ছুটেছে। বেড়াতে বেড়াতে চলে এলাম বরফের রাজত্বে। সামনেই নগাধি-রাজের তুষার-শুভ্র বিরাট রূপ। দুজনে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি।

অস্ফুটস্বরে ভাইপো বলে, নাঃ—আবার এখানে আসতেই হবে।

আমি হাসি। ভাবি, তার বৈজ্ঞানিক মন কি দেখল, কি পেলো—কে জানে?

তবে এটুকু জানি,—আবার আসতেই হবে!

৩

আবার বছর ঘুরে যায়। আবার মে-মাসও আসে।

আবার হিমালয়-যাত্রার প্রস্তুতি করি।

এবার আর ভাইপো প্রশ্ন করে না। দুঃখ জানায়, নতুন কাজে যোগ দিয়েছি; কোনমতে বার হবার উপায় নেই।

কিন্তু, দেখে নিও আসছে বছর যাবোই—গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী ঘুরে আসতে হবে।

জানি, সে যাবেও।

এমনি করে আমারও বারবার হিমালয়-যাত্রা। কি যে পাই, কত যে পাই—ভাষায় প্রকাশ হয় না, শুধু বুঝি, মন ভরে উঠে—প্রশান্তির প্রদীপ্তিতে পরিতৃপ্তি আনে।

৪

এবার কিন্তু কেদার-বদরীর পথেই শুধু যাবো না। গঙ্গোত্রী হয়ে গোমুখও দেখে আসার আকাঙ্ক্ষা। কেদার-বদরীর বিবরণীর অভাব নেই। গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী যাত্রা-পথের কাহিনীও পড়ি। এর পূর্ব্বেও ও-পথে গিয়েছি। সানন্দে ঘুরে এসেছি। সবারই অভিজ্ঞতা যে একই হতে হবে এমন কোন কথা নেই। না-হওয়াই স্বাভাবিক। চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি, শরতের আকাশে ভেসে-যাওয়া সাদা মেঘখানি বিভিন্ন জলাধারের জলের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন আকারের ছায়া ফেলেছে। অথচ, কোন কোন লেখায় পথের দুর্গমতার যে

বিভীষিকা সৃষ্টি করে তা দেখে মনে সন্দেহ জাগে—আমি কি তবে অন্য কোথাও গেছি—ও-পথেই যাই নি!

পথের কষ্ট আছে, ঠিকই। হিমালয়ের পাহাড়-পথে দুর্গমতাও বিচিত্র নয়। কিন্তু, সেটা বড় কথাও নয়, ভয়েরও নয়। কেদার-বদরীর যাত্রা-পথ এখন ত বাস্ চলাচলের ফলে সহজ ও সুগম হয়েছে। গেলেই হোল। যাত্রীর স্রোতও অবিরত বয়ে চলেছে—পাহাড়ে ঝরণার মত।

তাই, সে-পথের পরিচয় দেবার জন্যে এ-লেখার অবতারণা নয়। গঙ্গোত্রী যাত্রা-পথেরও নয়। গোমুখে যাত্রী যায় অল্প। সেই পথেরই কাহিনী বলা এর উদ্দেশ্য।

৫

কলিকাতা থেকে হরিদ্বার রেল-পথ। হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশ ষোলো মাইল,—রেলের শাখা-লাইনও আছে, বাস্-ও চলে। হৃষীকেশের পরই পাহাড় সুরু। স্তরে স্তরে গিরিশ্রেণী আকাশ স্পর্শ করতে চলেছে। হৃষীকেশ থেকে গঙ্গোত্রী-পথেও ১৯৪৯ সাল হতে বাস্ চলাচল

সুরু হয়েছে। কেদার-বদরীর বাস্ একদিকে চলে গেল, গঙ্গোত্রী-পথের বাস্ ভিন্ন পথে নরেন্দ্রনগরের দিকে পাহাড়ে উঠতে লাগল। নরেন্দ্রনগর পার হয়ে, টেহেরী ছেড়ে এসে হরিদ্বার থেকে ৮২ মাইল দূরে ধরাসু। বাস্-এর পথ আপাততঃ এইখানেই শেষ। আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার আয়োজন চলেছে।

ধরাসু গঙ্গার উপর। এখান থেকে গঙ্গার উপত্যকা দিয়ে একটি পথ চলে গিয়েছে গঙ্গোত্রী। ৭৫ মাইল দূর। আর একটি পথ বামদিকের গিরিশ্রেণী অতিক্রম করে নেমেছে যমুনার উপত্যকায় এবং যমুনার কূল ধরে চলে গেছে যমুনোত্রী। ধরাসু থেকে যমুনোত্রী ৪৮ মাইল। পাঁচ বছর আগে যমুনোত্রী দেখে এসেছি। এবার ও-পথে যাবার কথা নয়। গঙ্গোত্রী হয়ে গোমুখ যাওয়াই উদ্দেশ্য।

ধরাসু থেকে পায়ে চলার পথ সুরু। হাঁটা পথ হলেও প্রশস্ত পথ—ভয়ের কোন কারণ নেই। নিশ্চিন্ত মনে নির্ভয়ে পথ চলা যায়। ক্বচিৎ কোথাও পাথর বেশী হলে পথ অপ্রশস্ত হয়, কিন্তু সেখানেও চলাচলে কোন আশঙ্কা নেই। একমাত্র, পাহাড় ধ্বসে গিয়ে পথ যদি নিশ্চিহ্ন

হয়—তখনি সাময়িক চলাচলের অস্থায়ী পথটুকু সংকীর্ণ হয়, মনে হয়ত ভয়ও জাগায়। কিন্তু, বর্ষার আগে খুবই কম পাহাড় ধ্বসে, তাছাড়া অসমর্থ বৃদ্ধ যাত্রীদের স্বচ্ছন্দে সে-সব পথ অতিক্রম করতে দেখে মনে সাহস জাগে। আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদও ত কখন শোনা যায় না। বড় সহরের প্রশস্ত রাজ-পথেও চলাচলের বিপদ কি কম!

ধরাসু থেকে গঙ্গোত্রী পাঁচ ছয় দিনের পথ। নয় মাইল অন্তর ধর্ম্মশালা। কেদার-বদরীর পথের মত অত ঘন ঘন চটী বা গ্রাম পাওয়া যায় না। তাই, এ-পথে নয় মাইলের কম পড়াও নেই, অর্থাৎ সারাদিনে নয় মাইল অথবা আঠারো মাইল যেতেই হয়।

উত্তরকাশী, ভাটোয়ারী, গাঙ্‌নানী, হর্‌শীল্‌, ধরালী—ছাড়িয়ে এসে গঙ্গোত্রী। সাগরবক্ষ হতে ৯৯৫০ ফিট্‌ উঁচু।

সবগুলিই গঙ্গার উপর মনোরম স্থান।

মাঝে দুইটি বড় চড়াই আছে। প্রথমটি ‘সুখী’র চড়াই,

—চড়াই উঠার সুখ নেই, তবে চড়াই-শেষে বিশ্রামে সুখ আছে। দ্বিতীয়টি, গঙ্গোত্রীর আগেই 'ভৈরব-ঘাটি'-র চড়াই। চড়াই হিসাবে এর খ্যাতি আছে, তবে খ্যাতির তুলনায় ভীতিকর নয়।

৬

গঙ্গোত্রী ছোট জায়গা।

বিরাট্ গিরিশ্রেণীর মাঝে একটি মন্দির ও কয়েকখানি ঘর,—যেন প্রকাণ্ড এক বটগাছের শাখায় ছোট্ট একটি পাখীর বাসা।

মন্দিরের পাশেই গঙ্গা।

সেই জাহাজ-ভেসে-যাওয়া সুবিস্তীর্ণ সুগভীর ভাগী-রথী নয়,—উপলবহুল ক্ষীণকায়া পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী। হিমশীতল জল। গৈরিকবসনা। কলস্বরে বয়ে চলেছেন। উচ্ছল উদ্বেল।

গঙ্গার উপর কাঠের ছোট পুল। অপর পারে সাধু-

সন্তদের আশ্রম। ছোট ছোট এক একটা ঘর। চারিদিকে দেবদারুর গহন বন। সেই বনের ধারে গঙ্গার তীরে একান্তে সাধন-ভজনের নিভৃত স্থান।

এ-পার থেকে হঠাৎ দেখে চম্‌কে উঠি। কই, পাঁচ বছর আগে অমন ঘর-বাড়ী ত ওপারে দেখি নি! এক জায়গায় কয়েকটি অতি-মনোরম বাংলো-প্যাটার্ণের ঘর। যেন একটা নতুন সৌখীন কলোনী। শুনি, এক স্বামীজি তাঁর আশ্রমের সংস্কার করেছেন। ঝক্‌ঝকে বাড়ীগুলি সূর্য্যকিরণে ঝল্‌মল্‌ করতে থাকে। কিন্তু, সেই প্রশান্ত আবেষ্টনীর মাঝে সে উজ্জ্বলতা উদ্ধত মনে হয়,—যেন পূর্ণিমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মাঝে প্রখর বৈদ্যুতিক আলো। চোখে ও মনে আঘাত হানে।

৭

তীর্থ-ভ্রমণের এক প্রধান অঙ্গ সাধু-সঙ্গ। তাই, পুণ্য-কামী তীর্থসেবীদের তীর্থক্ষেত্রে এলেই সাধু-সন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠে।

জানতাম, সকাল দশটায় ধর্ম্মশালায় সাধুদের ভাণ্ডারা

দেওয়া হয়। দিনের মধ্যে একবারই। অনেক সাধু আসেন,—একসঙ্গে দর্শনও মেলে।

সঙ্গীদের উৎসাহে প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালাম।

দুটি পাশাপাশি ঘর—বারান্দার উপর দুটি জানালা। জানালায় ফোকর-কাটা,—যেন ষ্টেশনের টিকিট-ঘর। ঘরের ভিতর কালী-কম্‌লী-ক্ষেত্রের লোক, খাবার নিয়ে বসে আছেন। বাইরে বারান্দায় ও চত্বরে সাধুরা এসে জমায়েৎ হচ্ছেন। কাঠের বেঞ্চও দুই-তিনটি পাতা আছে। কেউ কেউ তাতে বসেছেন। অনেকেরই রুক্ষ রূপ—কোমল কান্তি নয়,—কঠিন, কঠোর। কারো কারো চোখে-মুখে মধুর হাসি,—শিশুর সরলতায় সুস্নিগ্ধ। সবারই নগ্ন পদ। অল্প কয়েক জনের অঙ্গে আচ্ছাদন আছে—মোটা কম্বল বা চাদর। অনেকেই নগ্ন দেহ—কৌপীনমাত্র সার। কারো কারো তাও নেই—সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। সবাই জটাজূটধারী। প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি মহাত্মা এসেছেন। দুই একজন পরস্পর কথা বলছেন। নইলে, প্রায় সকলেই নির্বাক্। অনেকে মৌনীও আছেন। সকলেরই হাতে একটি বা দুইটি পাত্র—কোনটি তামার, কোনটি পিতলের, কোনটি বা লাউ-এর তৈরি।

এখানেও 'কিউ'।

একে একে সার বেঁধে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। ভিতর থেকে খান ছয়েক রুটী, ভাত ও ডাল বা তরকারী দেওয়া হচ্ছে।

কেউ বারান্দায় বসে খাচ্ছেন, কেউ বা গঙ্গার ধারে পাথরের উপর গিয়ে বসছেন, কেউ কেউ বা নিজ আশ্রমে অপর পারে চলেছেন।

একজন নাগা সাধু দাঁড়িয়েই খাচ্ছেন; শুনলাম, তিনি কখনও বসেন না, শোনও না।

সবাই অপর-পারের আশ্রমবাসী। কিন্তু, মহাত্মারা সকলেই ভাণ্ডারা নিতে আসেন না। আশ্রমে পেঁাছে দিলে তাঁদের কেউ কেউ গ্রহণ করেন। আবার, এমনও কয়েকজন আছেন যাঁরা এ-সব অগ্নি-পক্ক কোন কিছু ভোজন করেন না। দর্শনার্থীরা কিস্‌মিস্‌, বাদাম ইত্যাদি দিয়ে প্রণাম করে আসে, শুধু তাই খান।

ছোট একটি ঘটনা ঘটে গেল।

সঙ্গীদের সঙ্গে একপাশে দাঁড়িয়ে এ-সব দেখছিলাম। ক্ষেত্রের কর্ত্তৃপক্ষের একজন কাজকর্ম্মের তদারক করছিলেন। এগিয়ে এসে আমাদের একটা বেঞ্চে বসতে অনুরোধ করলেন। বেঞ্চটির এক ধারে বসে দুটি সাধু খাবার নেবার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। খালি অংশ-টুকুতে তাঁদের সঙ্গে একাসনে বসতে আমরা সঙ্কোচ বোধ করলাম। ক্ষেত্রের লোকটি জানালেন, তাতে কিছু দোষ নেই। কিন্তু, আমরা বসা-মাত্রেই সাধু দুটির মধ্যে একজন বিশেষ বিরক্ত হলেন। তাঁর চোখে-মুখে উগ্র-ভাবে রুষ্ট-ভাব আত্মপ্রকাশ করলো। অপর সাধুটি সেখানে নিঃসঙ্কোচে বসে রইলেন এবং তাঁর মৃদু নিষেধ সত্ত্বেও এ-সাধুটি অবোধ্য ভাষায় কি বলতে বলতে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে গেলেন।

লজ্জায় আমাদের মন সংকুচিত হয়ে উঠল।

আমরাও তখনি বেঞ্চ ছেড়ে একপাশে এসে দাঁড়ালাম।

সাধুটি আমাদের দিকে তখনও রোষ-নেত্রে তাকিয়ে আছেন। দুর্ব্বাসামুনির কথা মনে হোল। শকুন্তলার প্রতি সেই অকরুণ অভিশাপ—'যার কথা এমনি একান্ত

মনে চিন্তা করছিস্—সে-ই তোকে দেখে চিনতে পারবে না!'

ভাবি, কলির এই নব-দুর্ব্বাসাও হয়ত অভিশাপ দিচ্ছেন, —'তোরা যেমন আমার পাশে এসে বস্‌লি, তেম্নি তোদের পাশেও একাসনে এসে বসবে—অচ্ছুত-অস্পৃশ্যেরা।'

মনে মনে বলি, ঠাকুর, অনেক দিন বনে চলে এসেছ। খবর রাখো না। তারা শুধু একাসনে বসবারই অধিকার পায় নি, এখন দেবতাদের হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করার লোভে মন্দিরে এগিয়ে চলেছে! তা চলুক,—ভেদাভেদ যত ঘোচে, ঘুচুক। কিন্তু, হিমালয়ে এসে তুমি পেলে কি? অঙ্গের বসন-ভূষণ বহিরাবরণ সব কিছুই ছেড়েছ, অথচ মনের কোণে মান-অভিমানের মানুষ-স্বভাবটি এখনও তেম্‌নি আঁক্‌ড়ে আছ, ক্রোধের ফণা এখনও তেম্‌নি দুলছে! হিমালয়ের শান্তির মাঝে এখনও সেই অ-শান্তি!

৮

বিকালে ওপারে চললাম সাধু-সন্দর্শনে।

এ-পারে মানুষের বাসা, ও-পারে সাধুর বাস। এ-পারে পাথরের বাড়ী, কয়েকটি দোকান-ঘর, জানকীবাঈ-এর তৈরি গঙ্গামায়ীর মন্দির। ও-পারে শান্ত তপোবন, সাধুদের ছোট ছোট কুটি, তাঁদের মনোমন্দিরে আরাধ্য দেবতা। এ-পারে যাত্রী-জীবনের উচ্ছল চঞ্চলতার স্রোত, ও-পারে ধ্যান-গম্ভীর নিস্তরঙ্গ জীবন-জলধি।

মাঝখানে পুণ্যতোয়া ভাগিরথী। তারই উপর পারা-পারের সেতু। এ-পারের মানুষের সঙ্গে ও-পারের সাধুর যোগাযোগ সৃষ্টি করেছে।

এ-পারের মানুষ যায় সাধু-সন্দর্শনে, ও-পারের সাধুরা আসেন ভাণ্ডারার সন্ধানে। এ-পারের সংসার-সন্তপ্ত মন সাধু-সন্তদের কাছে ছোটে শান্তির আশায়, ও-পারের আকাশ-মার্গীরা গৃহীর দুয়ারে এসে দাঁড়ান ভিক্ষার ঝুলি হাতে। যেন, জননী জাহ্নবী তাঁর দুই কোলে ভিন্ন-প্রকৃতি দুই সন্তান নিয়ে মাতৃ-গৌরবে চলেছেন।

পুলের উপরে এসে দাঁড়ালাম।

পাঁচ বছর আগেকার কথা মনে হয়। মার সঙ্গে এখানে এসেছিলাম। সেবারও এমনি সাধু-দর্শনে বার হয়েছিলাম। ধর্ম্মশালা থেকে বার হবার আগেই হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করে বৃষ্টি নেমেছিল। শীতও তেমনি দশগুণ হয়ে দেখা দিল।

মাকে বললাম, এ-ত ঠাণ্ডায় বা'র হবে? মন্দিরে ত দেবতাই দর্শন হয়েছে—আবার সন্ধ্যায় আরতি দেখবে,—সাধু-দর্শন না হয় থাক্-ই।

মা বলেন, সে কি বাবা! তা কি হয়? তীর্থে এসে সাধু-দর্শন করব না? মহাত্মাদের দর্শনে কতো পুণ্য, কতো তৃপ্তি!—বৃষ্টি ত কমে এল, চলো যাওয়া যাক্।

অতএব, যাওয়াই হয়। একে গঙ্গোত্রীর ঠাণ্ডা, তায় বৃষ্টি-বাদল। গায়ে বেশ কিছু গরম জামা-কাপড় চাপালাম।

মার ডাণ্ডী-ওয়ালাগুলি পাহাড়ী হলেও মুড়িশুড়ি দিয়ে ডাণ্ডী নিয়ে চলেছে।

পাণ্ডাজি শ্রীভূমানন্দ বললেন, প্রথমে চলুন এখানকার এক মস্ত সাধুকে দেখতে।

পুল পার হয়ে বাঁদিকে একটু উঠেই তাঁর কুটি।

পাথরের ছোট পাঁচিল-ঘেরা খানিকটা জমি। তার মাঝখানে একটি ছোট্ট ঘর। পাঁচিলের এক কোণে আরও একটি ছোট ঘর আছে। মাঝখানের ঘরখানির কাছে এসে দাঁড়ালাম। চারিদিকে খোলা রোয়াক্। একটি-মাত্র ছোট দরজা—গঙ্গার দিকে মুখ করা। জানালা নেই।

দরজার সামনে এসে ভিতরে তাকালাম।

যোগাসনে বসে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি। জটাধারী। স্থূল-কায়। তাম্রকান্তি। সারা অঙ্গে কোথাও কোন আবরণ নেই। জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি—নিশ্চল নিস্পন্দ। নিষ্পলক নেত্রে যেন গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ দেখে মনে হয়, এ যেন জীবন্ত মানুষ নয়,—পাষাণ-মূর্ত্তি। কাশীতে-দেখা ত্রৈলঙ্গস্বামীর প্রতিমূর্ত্তিটি চোখের উপর ভেসে উঠল।

অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি। পান্ডাজির ডাকে চমক ভাঙ্‌ল। বললেন, মাকে নিয়ে ঘরের ভিতরে চলুন।

মাথা অনেকখানি হেঁট করে দরজায় ঢুকতে হয়; কিন্তু, এখানে আপনা হতেই ত মাথা নত হয়ে আসে।

মার সঙ্গে প্রণাম করে মূর্ত্তির পাশে দাঁড়ালাম। এতক্ষণে পাথর-মূর্ত্তি স্পন্দন পেলো। আঁখির তারা ঘুরিয়ে একবার আমাদের তাকিয়ে দেখলেন। প্রশান্ত বদনে মধুর হাসির অস্ফুট-রেখা ফুটে উঠল। ঈষৎ ইঙ্গিত করে আমাদের বসতে বললেন,—হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করলেন।

মা যুক্তকরে তাঁর স্নেহচ্ছায়াতলে নিবিষ্টচিত্তে বসে আছেন। দুনয়নে আনন্দাশ্রুর ধারা। প্রসন্ন পরিতৃপ্তির প্রতিমূর্ত্তি!

এদিকে সাধুর চোখের দৃষ্টি আবার গঙ্গার ধারার দিকে নিবদ্ধ হয়েছে। ক্ষণিকের সজাগতা কোথায় মিলিয়ে গেছে। আবার, নিষ্পলক আঁখি, নিস্পন্দ দেহ। মনে হয় প্রাণহীন। অথচ, তারি সান্নিধ্য মনে এক অপূর্ব্ব

অনুভূতি আনে। বুদ্ধির সীমা-বদ্ধ, পরিচিত দেশ-কাল অতিক্রম করে মন কোন অসীমতার মাঝে ভেসে যায়। অনাদি কাল যেন একটি ক্ষুদ্র মুহূর্তের মাঝে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতিস্থ হতে চেষ্টা করি।

মনে পড়ে, পল্ ব্রাণ্ টনের কথা। অরুণাচলের ঋষি মহর্ষি রমণ-এর সাথে তাঁর প্রথম-সাক্ষাতের বিবরণ। দেশ-কাল-পাত্র—পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী—সব কিছুরই প্রয়োজনীয়তা কি করে নিমেষে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল! অথচ, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ, বিধর্ম্মী বিদেশী!

ইতিমধ্যে ঘরের ভিতর আর একটি ব্রহ্মচারীও এসে দাঁড়িয়েছেন। গেরুয়া আলখাল্লা পরা। জটাভার চূড়া করে মাথার উপর বাঁধা। মুখে কঠোর সন্ন্যাস-জীবনের সুস্পষ্ট পরিচয়, অথচ, কোমলতাও আছে। প্রৌঢ় হলেও শ্মশ্রু-গুম্ফের রেখা নেই।

সাধুটি সম্পূর্ণ মৌনী। ব্রহ্মচারীজি তাই তাঁর কথা ধীরে ধীরে বলছিলেন, একশো বছরের উপর বয়স; সাধারণতঃ এমনি ধ্যানরতই থাকেন। আমি সেবা করি।

প্রণামী দেওয়ার প্রশ্নে ব্রহ্মচারীজি জবাব দিলেন, কিছু-কাল আগে এক যাত্রী কিছু দিয়ে গিয়েছিলেন, তা এখনও রয়েছে; তাই নেওয়ার প্রয়োজনও নেই, রীতিও নেই।

আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে, আবার প্রণাম করে আমরা চলে এলাম। তখনও তিনি তেমনি নিশ্চল, নিস্পন্দ। এমনি করেই তাঁর দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, বছরের পর বছরও ঘোরে। কি করে থাকেন, কেন থাকেন,—কি ভাবেন, কেনই বা ভাবেন এবং কি-ই বা পেয়েছেন—এ-সব সমস্যার মীমাংসা হয় না।

মাকে নিয়ে আরও সাধু-দর্শন করে ধর্ম্মশালায় ফিরলাম। স্থানীয় লোকজন এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছি। সেই সাধুজিটির কথা উঠল।

একজন বললেন, এক সময়ে ওঁর মত বড় সাধু দেখা যেতো না। সাধু-সমাজে ওঁর শীর্ষ স্থান ছিল।

"ছিল" শুনেই মনে চমক লাগল।

বললাম, কেন, উনি কি এখনও বড় একজন মহাত্মা নন্ ? না, আরও বড় একজন এসেছেন?

উত্তর শুনি, সে-সব অনেক কথা। ঐ বিরাট পুরুষের কাছে ওটা হয়ত একটা ছোট্ট ঘটনা, কিন্তু সেইটিই এখন মস্ত বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

উত্তরদাতাও একজন গেরুয়াধারী হিমালয়বাসী ব্রহ্মচারী। তিনি বলতে থাকেন, উনি একজন মহাপুরুষ সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিতিক্ষার দিক থেকে দেখতে গেলে সাধুরা সকলেই এঁকে খুব উঁচু বলেই মানেন। শাস্ত্র-জ্ঞানও গভীর। নিজের চোখেই ত এঁর কষ্ট-সহিষ্ণুতা দেখে এলেন। এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও কিরকম বসে রয়েছেন। এ-শীত তো ওঁর কাছে কিছুই নয়। আগে বছরের পর বছর কাটিয়েছেন গোমুখে—বরফের মধ্যে। সেখানেও ঠিক ঐভাবে সারা বছর থাকতেন, গায়ে কোনও আবরণ নেই, ধুনীর আগুনও নেই। অথচ, বয়সও হয়ে গেছে একশোর উপর। ইদানীং কয়েক বছর আর গোমুখে যান্ না,—এখানেই থাকেন। সত্যিই আশ্চর্য্য ক্ষমতা। একবার পণ্ডিত মালব্যজি ওঁকে কাশীতে নিয়ে গিয়েছিলেন—তাঁর

বিশ্ববিদ্যালয়ে কি একটা উদ্বোধন ব্যাপারে। কাগজেও সে-কথা তখন বার হয়েছিল।

বললাম, হাঁ,—এখন মনে পড়ছে বটে,—পড়েছিলাম, হিমালয় থেকে কোন্ এক বড় সাধুকে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন।

ব্রহ্মচারী বললেন, ইনিই তিনি। তারপর শুনুন ব্যাপার। ওঁর জীবনের রাহু হয়েছে ওঁর ঐ সেবক-সাধুটি।

আশ্চর্য্য হলাম। বললাম, কুটির ভিতর আলখাল্লা-পরা যে সন্ন্যাসীটি দাঁড়িয়েছিলেন? কেন, বেশ সুন্দর ত কথা বলছিলেন—শাস্ত্রজ্ঞানও বেশ আছে দেখলাম। ভালই ত লাগ্‌ল।

মুচ্‌কে হেসে ব্রহ্মচারী বললেন, ঐ ত ব্যাপার! ওটি সন্ন্যাসী নয়,—সন্ন্যাসিনী। এখন ঘটনাটা শুনুন। সাধুজি কয়েক বছর হিমালয় থেকে নেমে নীচে হরিদ্বারের দিকে যেতেন। সেদিকে কিছুকাল কাটিয়ে আবার উপরে চলে আসতেন। এ-পথে মাঝে পাণ্ডাদের একটা গ্রাম আছে, দেখেছেন নিশ্চয়—ধরালী। প্রতি

বছর আসা-যাওয়ার সময় সেই গ্রামের কাছে তিনি রাত কাটাতেন। তখন এই মেয়েটি ছিল খুব ছোট। সাধুকে দেখতে পেলেই তাঁর কাছে ছুটে আসত, সারাক্ষণ তাঁর কাছে কাছে থাক্‌ত ইনিও খুব স্নেহ করতেন তাকে। এমনি করে বছরের পর বছর যায়, মেয়েটিও বড় হয়ে উঠে। তারপর, তার বিয়েও হোল; কিন্তু স্বামীর ঘর করা তার ভাগ্যে ছিল না। শেষে গেরুয়া পরল, এই সাধুজির কাছে সন্ন্যাস নিল, এঁরই কাছে এসে রইল। এঁর কাছে শাস্ত্র-শিক্ষাও করেছে—তখন ইনি মৌনী ছিলেন না, কথা বলতেন। কঠিন সন্ন্যাস-ব্রতও পালন করেছে। কিন্তু, এ-সব হলে হবে কি! এঁর কাছে এসে থাকার পর থেকেই—সাধুজির সম্পর্কে লোকমহলে কথা উঠল—তাদের মুখ ত কেউ চাপা দিতে পারে না! ফলে, আগে ওখানে যাত্রীর যত ভীড় হোত এখন আর তত হয় না।

গল্প শেষ করে ব্রহ্মচারীজি চুপ করলেন, তারপর একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, আমিও বলি, মশাই, কাজটা ঠিক হয় নি। অত বড় সাধু—অত বিরাট শক্তিশালী পুরুষ; চিরকাল একা ছিলেন, একাই থাকলে হোত। কি প্রয়োজন ছিল একজন সন্ন্যাসিনীকে কাছে থাকতে

দেবার? আর নিজে থাকেন ত ঐ রকমভাবে! নিজে মহাপুরুষ হতে পারেন, একশো বছরের উপর বয়সও হতে পারে—কিন্তু মেয়েটা ত আর সে ঐশীশক্তি পায় নি!

নির্ব্বাক্ হয়ে শুনি। মন্তব্য শুনে স্তব্ধ হই। ভাবি, এই দুর্গম হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলে সাধু-জীবনের ভাল-মন্দের বিচার-কাঠিও কি একই? এখানেও মানুষের মনে সেই চির-জাগরুক সন্দেহের কীট, কুৎসা-রটনার অদম্য স্পৃহা!

অতি-বিচিত্র এ বিশাল জগতে এ-ও এক চিরন্তন করুণ সত্য।

হাসি পেলো। বললাম্, ব্রহ্মচারীজি, সাধুজিকে অতই শক্তিশালী বিরাট পুরুষ বলে যখন মানলেনই তখন সামান্য একটি মেয়েকে উন্নত করার ক্ষমতাটুকুও তিনি রাখেন, এটুকু স্বীকার করতে ক্ষতি কি?

ক্ষতি কিছুই নয়। কিন্তু, মানুষ-স্বভাব যাবে কোথায়?

৯

সেদিন সন্ধ্যায় শোনা সে-কাহিনী আজও বেশ মনে আছে। পুলের উপর দাঁড়িয়ে পাঁচ বছর আগেকার সে-সব কথা ভাব্‌ছিলাম।

সাম্‌নেই সাধুজির সেই আশ্রম। প্রায় তেমনি আছে। প্রথমে সেই দিকেই গেলাম। চীর্‌গাছের ফাঁক দিয়ে পশ্চিমের রোদ এসে পড়েছে কুটির উপর। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ।

কুটি-র সাম্‌নে এসে দাঁড়ালাম।

সেই ঘর, সেই দুয়ার, সেই রোয়াক—সবই তেমনি আছে। এবার সাধুজি ঘরের মধ্যে নয়, রোয়াকে বসে আছেন। চেহারা প্রায় তেম্‌নি আছে—একটু শীর্ণ। লোলচর্ম্ম বার্দ্ধক্য ঘোষণা করছে। বয়স যে বহু বছর—সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ, তবে কতো তা দেখে বলা সম্ভব নয়। তেমনি গঙ্গার দিকে চেয়ে বসে আছেন। গঙ্গাই দেখেন, না, আর কিছু ?

ভাবি, পাঁচ বছর আগেকার সে-ই দেখা কি এখনও চলছে ?

এবার, কিন্তু, সম্পূর্ণ সজাগ। আমরা প্রণাম করতেই আশীর্ব্বাদ করলেন; হাত নেড়ে বসতে ইসারা করলেন।

সেই ব্রহ্মচারিণীও এলেন। হাঁ, মেয়েই বটে। তবে ধরা কঠিন। চেহারার মাঝে, গলার স্বরে অতি সামান্যই ইঙ্গিত আছে।

স্বামীজির সঙ্গে এবার কথা হতে লাগল। তিনি এখনও মৌনী। তবুও হাত নেড়ে মুখের ভঙ্গীতে ভাবপ্রকাশ করছিলেন। কখন কখন ব্রহ্মচারিণীকে ইঙ্গিত করছিলেন, তিনি ওঁর হয়ে বলছিলেন।

আমার সঙ্গীর ও আমার এই দ্বিতীয়বার গঙ্গোত্রী আসা শুনে খুশী হলেন। ঈষৎ হেসে ইসারা করে বললেন, আবার আসতে হবে।

গোমুখ যাবার ইচ্ছা আছে শুনে আরও আনন্দ প্রকাশ করলেন। হাত দিয়ে বোঝালেন, রাস্তা নেই, কঠিন পথ।

তবে কোন ভয় নেই; সব সময়েই যেন মনে বিশ্বাস রাখি, ঠিক দর্শন মিলবে। অতি অপরূপ স্থান।

আকাশের দিকে হাত তুলে বোঝালেন, সবই তাঁর রূপ, তাঁরই অপরূপ লীলা।

স্বামীজির ইঙ্গিতে ব্রহ্মচারিণী গঙ্গার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন,—পুরাণ-কথিত ভাগীরথীর কত পুণ্য-কাহিনী।

স্বামীজির আশীর্ব্বাদ নিয়ে প্রফুল্লচিত্তে চলে এলাম। গোমুখ-যাত্রার সঙ্কল্পও সুদৃঢ় হোল।

এরপর সেই স্বামীজিকে আর একবার দেখেছিলাম। সেদিন গোমুখ-অভিমুখে যাত্রা করছি। সকালে। ওপার থেকে রওনা হয়েছি। হঠাৎ দেখলাম, এ-পারে গঙ্গায় স্নান সেরে সেই উলঙ্গ মূর্ত্তি আশ্রম পানে উঠে চলেছেন। তাঁর দুই হাতে দুইটি বাল্‌তি। নিশ্চয় গঙ্গার জল ভরা। বাল্‌তি দুটি অক্লেশে দুই হাতে নিয়ে সহজ স্বচ্ছন্দগতিতে চড়াই-পথে চলেছেন। সুদীর্ঘ, সরল, সবল দেহ। কে বলবে, একশো বছরের উপর বয়স?

চোখের উপর একটা ছবি ভেসে উঠল।

পুরীর সুনীল সফেন সমুদ্র। তারি বালুকা-তীরে একটি নগ্ন শিশু দুই হাতে দুটি খেলার ছোট বাল্‌তি নিয়ে ছুটে চলেছে!

শিশুরই মত সরল, নিষ্পাপ।

সত্য-শিব-সুন্দরের সহজ সোপানই বুঝি বা শিশু-মন।

১০

সাধুজির আশ্রম থেকে গেলাম আর এক সাধুর কুটিতে।

তিনি বাইরে পাথরের উপর বসে বই পড়ছিলেন। ইনিও বিবস্ত্র। তবে মৌনী নন্‌। দীর্ঘ দেহ, দীর্ঘ জটাজুট।

সাদরে আমাদের বসতে বললেন।

একটা চীর্‌গাছের গুঁড়ি পড়ে ছিল—সাধুকে প্রণাম করে তারই উপর সকলে বসলাম।

সাধুটি বড় স্নিগ্ধ হাসেন, সুমিষ্ট কথা বলেন।

কুটি-র দিকে তাকিয়ে দেখেই চিনতে পারলাম। গতবার এখানেও এসেছিলাম। তখন অপর আর একজন সাধু ছিলেন। তিনিও নাগা, তবে মৌনী ছিলেন।

বেশ মনে পড়ে, ঘরের ভিতর মাটীর মেঝেতে ধুনী ছিল, তার থেকে এক টুক্‌রা পোড়া কাঠ নিয়ে মাটীর উপর লিখে লিখে আলাপ করেছিলেন।

কলিকাতায় ভবানীপুরে থাকি শুনে লিখেছিলেন, সে-ত কালিঘাটের খুব কাছে। কালী-মা বড় জাগ্রতা দেবী—বলে উদ্দেশে প্রণাম করেছিলেন।

অনেকক্ষণ আলাপ হয়েছিল। মা সঙ্গে ছিলেন,—তাঁকে দেখিয়ে ইসারায় বলেছিলেন—ইনি আমারও মা।

শুনে মার চোখে জল এসেছিল।

কোন সেবায় আসতে পারি কিনা জিজ্ঞাসা করায় প্রথমে ঘাড় নেড়ে 'না' বলেছিলেন। তারপরে, অতি সঙ্কোচে

একটি ধ্পকাঠি বার করে দেখিয়েছিলেন,—ইচ্ছা হয় ত এই দিতে পার।

ধর্ম্মশালায় ফিরে এসে পাঠিয়েও দিয়েছিলাম।

তাঁর কাছ থেকে চলে আসার আগে মা বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন,—আর কোন কিছু চাই কিনা বলুন; হেসে আরও বলেছিলেন—আমি ত মা আছি।

সাধুটিও হেসেছিলেন—বড় ম্লান হাসি। তারপর, হাত তুলে সম্মতি জানিয়ে ধীরে ধীরে লিখলেন, যদি ইচ্ছা হয় এবং কোনও রকম অসুবিধা না থাকে ত আসামী এণ্ডির চাদর একটা পাঠাতে পার।

চাওয়া শুনে মা-র সে কী অপরিসীম আনন্দ।

কলিকাতায় ফিরেই পাঠানো হয়েছিল।

ধর্ম্মশালায় এসে তাঁর চাদর-চাওয়ার কারণও বুঝেছিলাম। কয়েক বছর তিনি গোমুখে ছিলেন। শীতকালেও থাকতেন সেই বরফের মাঝে। কিছুকাল

আগে সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও এখানে তাঁকে আনা হয়। শরীর এখনও সুস্থ হয়ে উঠে নি।

কাঠের উপর বসে ঘরের দিকে তাকিয়ে কয় বছর আগেকার সে-সব কথা আজ মনে হচ্ছে।

তিনি কোথায় জিজ্ঞাসা করায় জানলাম, আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরের বছরই দেহ-রক্ষা করেছেন।

হঠাৎ ঘরটা যেন খুব ফাঁকা ফাঁকা মনে হোল।

ক্ষণিকের পরিচিত, সংসার-ত্যাগী, হিমালয়-বাসী এক নাগা সন্ন্যাসীর মৃত্যু-সংবাদ। তবুও কিসের বেদনায় মন যেন ভারী হয়ে উঠল।

জরা-মৃত্যু তার বিশাল জাল এখানেও বিস্তার করেছে—কোথাও নিস্তার নেই। যেখানেই জীবন—সেখানেই মরণ!

পাথরের উপর বসে স্বামীজি বলছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর

৩

এই কয় বছর আমি এসেছি। বড় শান্তিময় স্থান। তবে, আমার আসন গঙ্গামায়ীর কিনারায় ঐ পাথরটি।

তাকিয়ে দেখলাম, একটি মসৃণ, সমতল পাথর,—ঠিক ধারার ধারেই।

বললেন, ঐখানে বসি। আপনা হতেই ধ্যান আসে। ভাগীরথীর কলোচ্ছ্বাস—সেই ত ভগবদ্ সঙ্গীত। গঙ্গাতীরে বাস—এই ত স্বর্গবাস। গঙ্গার জলে স্নান, গঙ্গাকে অবলোকন, গঙ্গার নাম স্মরণ, গঙ্গার মাহাত্ম্য সংলাপন—অমৃতময় এ জীবন।

হঠাৎ, কথা বলতে বলতে উঠে গেলেন। ঘর থেকে মুঠো ভরে কি নিয়ে এলেন। গেলেন, এলেন—এও যেন উলঙ্গ শিশুর ঘোরাফেরা।

কাছে এসে হাত বাড়িয়ে বললেন, নাও, প্রসাদ নাও।

চেয়ে দেখি, মুঠো ভরা কিস্‌মিস্ বাদাম। একটিমাত্র কিস্‌মিস্ তুলে নিলাম, মাথায় ঠেকালাম, মুখে দিলাম।

বললাম, এই যথেষ্ট।

আরও নিতে বলেন। তবুও নিই না। জানি, এই তাঁর একমাত্র আহার্য্য।

সেবার কথা উল্লেখ করি। গ্রহণ করেন না। হাসেন। বড় স্নেহ-ভরা ব্যবহার।

গোমুখ যাওয়ার কথা তুলি। শুনে খুশি হন্। উৎসাহ দেন্। বলেন, লোকে ভয় দেখাবে,—কিন্তু মনে বিশ্বাস রেখো—কোন ভয় নেই।

সেই একই অভয়-বাণী!

পরম-আত্মীয়ের মত বিদায় দেন্, আশীষ জানান।

কঠোর সন্ন্যাসী, অথচ অন্তরে স্নেহের ধারা। যেন, পাষাণ-কারা হিমালয়ে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।

১১

সেখান থেকে আরও এগিয়ে গেলাম।

একটি নতুন কুটি। ছোট। সাধুও নতুন এসেছেন। ঘরের সাম্‌নে বারান্দায় বসে আছেন। ইনি ঠিক নাগা নন্‌—সামান্য একটা কৌপীন আছে। তবে, মৌনী। যুবা পুরুষ,—মাংস-পেশীগুলি সবল সুন্দর স্বাস্থ্য ঘোষণা করছে। মুখ-চোখের হাবভাব, বসার ভঙ্গী—অনেক কিছুই শ্রীরামচন্দ্রের কিঙ্করের কথা স্মরণ করায়।

আশ্চর্য্য হলাম যখন তিনি আঙুল দিয়ে ঘরের ভিতর তাঁর আরাধ্য দেবতার মূর্ত্তির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করালেন,—সত্যই ত রঘুনাথজির মূর্ত্তি! সুন্দর সাদা ধব্‌ধবে পাথরের। দেখেই বললাম, এ তো জয়পুরের।

তিনি ঘাড় নেড়ে জানালেন, হাঁ।

এঁর কাছে শ্লেট্‌, পেন্‌সিল্‌ আছে। তাতে লিখে তাঁর বক্তব্য জানাচ্ছিলেন।

সারাক্ষণই রঘুনাথজির সেবায় আছেন। প্রবল বাসনা, তাঁর একটা আলাদা ছোট মন্দির করেন। কাজও সুরু করেছেন—প্রাঙ্গণের একপাশে দেখালেন।

গোমুখ যাওয়ার কথা আবার উঠ্‌ল। এ'র কাছেও সেই একই উৎসাহের বাণী,—কঠিন পথ, তবুও ভয় নেই, অন্তরে স্থির বিশ্বাস নিয়ে চলে যাও।

সবাই অটল বিশ্বাসের বাঁধ বে'ধে জীবনধারা বহিয়ে চলেছেন।

এ'কে আবার দেখেছিলাম পরদিন—গোমুখ যাওয়ার পথে।

একমনে মন্দিরের প্রাচীর তৈরি করছেন। সন্তান-সন্ততির আবাস-গৃহ নয়, আরাধ্য দেবতার মন্দির।

একাই দুই হাতে প্রকান্ড প্রকান্ড পাথর তুলে আন্‌ছেন। সর্ব্বাঙ্গের পেশীগুলি পাথরের ভারে ফুলে উঠেছে। শরীরে যৌবনের দীপ্তি। মুখে কিন্তু শিশুর সরল হাসি। পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে একটা দড়ির

সাহায্যে দেখছেন, ঠিক সোজা রাখা হোল কিনা। নিপুণ হাতে নিষ্ঠার সাথে কাজ করছেন।

ভাবি রাজমিস্ত্রী বা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন নাকি!

ঢেঁকি স্বর্গে এসেও সত্যিই ধান ভানে!

১২

অস্তমুখী সূর্য্য পশ্চিমদিকের পাহাড়ের অন্তরালে আত্মগোপন করেন। তাঁর বিদায়-বেলার শেষ আশীর্ব্বাদ পাহাড়ের মাথায় শাদা বরফের উপর রক্তচন্দনের তিলক আঁকে।

সঙ্গীরা বলেন, চলুন, এতক্ষণ ত গঙ্গার উপর-দিকে আসা গেল। এবার ফেরা যাক্,—গঙ্গার নীচের দিকে সেই এক সাধুর নতুন আশ্রমের সব বাড়ী দেখা গিয়েছিল ও-পার থেকে—সেখানেও ত যাবো।

অতএব সেখানেও যাই।

পথে এক পাহাড়ী নদীর উপর ছোট পুল। কেদার-শৃঙ্গ হতে কেদার-গঙ্গা নেমে এসেছেন,—বরফ-গলা ঘোলা জল। সগর্জ্জনে পুলের কিছু নীচেই ভাগীরথী গঙ্গায় আত্ম-সমর্পণ করছেন।

পথের বাঁদিকের পাহাড়গুলির পিছনেই কেদার-শিখর। এই কেদার-গঙ্গা ধরে যেতে পারলে দুই-তিন দিনেই এখান থেকে কেদারনাথে পৌঁছানো যায়। যায় বটে, তবে সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। দুর্গম গিরি-পথ,—চির তুষারে আচ্ছন্ন। বিপদসঙ্কুল হওয়া ত স্বাভাবিকই। কখন কখন সাধু-সন্তরা এ-পথে যাতায়াত করেন,—সেই নগ্ন-পায়ে, নগ্ন-গায়ে।

অত্যাশ্চর্য্য বোধ হয়।

১৯৪৭ সালে একটি সুইস দলের কয়েকজন গিয়েছিলেন,—অবশ্য অনেক সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে। একেবারে কেদার-শিখরে উঠেছিলেন—এই দিক দিয়েই। কেদার-নাথ থেকে কেদার-শিখরে এখনও কেউ উঠতে পারেননি।

মাথা উঁচু করে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখি। মাত্র

দুদিনের পথ! অথচ, আমাদের সেই কেদারনাথেই যেতে হবে একশো মাইলেরও উপর ঘুরে,—যাত্রী-পথ ধরে! প্রায় দিন দশেক লাগবে।

ভাবি, একবার এসে এ-পথে যাওয়ার চেষ্টা করলে হয়। কেদার-গঙ্গা যেন আকর্ষণ করতে থাকেন!

পুল পার হয়ে একটু এসেই সেই স্বামীজির নবীন আশ্রম।

একটা বেড়া-ঘেরা এলাকায় কতকগুলি সুন্দর বাড়ী। গেট্ দিয়ে ঢুকতে হয়। চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চাকচিক্যের ঔজ্জ্বল্য। একটি ঘরের সামনের বারান্দায় অনেকগুলি তামার বাসন সাজানো। কি উজ্জ্বল সেগুলির দীপ্তি! চারিদিকেই গৃহ-শ্রী। লক্ষ্মীর চরণ-চিহ্ন। আশ্রমের শান্ত আব্-হাওয়া নয়, কর্ম্ম-ব্যস্ততার সজীবতা। কয়েকজন লোকজনও ঘুরছে।

স্বামীজি কি কাজের তদারক করছিলেন। আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন, অভ্যর্থনা করলেন। আমরাও হাত তুলে নমস্কার করলাম।

প্রৌঢ় বয়স। সুন্দর স্বাস্থ্য। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। দাড়ি-গোঁফ-মাথা সবই কামানো। পরনে গেরুয়া লম্বা আলখাল্লা। দামী ভাল কাপড়ে তৈরি। শুধু বেশ-ভূষাতেই ভদ্র নন্, কথাবার্ত্তা, ব্যবহারেও সামাজিক ভদ্রতার পরিচয় দেন্। বসবার জন্যে কম্বল পাত্‌তে হুকুম করলেন, বলেন, এখানে ত চেয়ার দিতে পারবো না, শুধু কম্বলই আছে। তবে এ আনিয়েছিলাম অনেক দূর দেশ থেকে,—কেমন জিনিস দেখুন না!

সত্যই, বেশ ভাল কম্বল—দামী, রঙ্-বেরঙের।

কিন্তু, বসতে ইচ্ছা করে না।

বাইরে আঙিনার দিকে তাকাতেই মনে পড়ল, গতবার মাকে নিয়ে এখানেও এসেছিলাম। ঐ পাথর-বাঁধানো জায়গাটায় ইনি বসেছিলেন। সাম্‌নে কতকগুলি যাত্রী। তাদের ভাষণ দিচ্ছিলেন। নানান্ কথা,—ধর্ম্মের ত বটেই, সামাজিক, রাজনৈতিক কোন প্রসঙ্গেরই বাদ ছিল না। মাঝে মাঝে ইংরাজি শব্দেরও প্রয়োগ ছিল। আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চলে গিয়েছিলাম। সেবারও বসতে বলেছিলেন—বসা হয় নি।

এবার বাড়ীঘর অনেক বেড়েছে। স্বামীজি চা খেতেও অনুরোধ করলেন। বললেন, চা, খাবার, কিছু খান্। সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে। চা ত হরদম্ই চলছে—তৈরি রয়েছে। যাত্রীরা আসে অনেকে। আমার নিজের লোকজনও রয়েছে।

কিন্তু, চা খেতেও মন সরে না। বলি, না, থাক্। একটু আগেই খেয়ে বেরিয়েছি। এখন বেলা বেশী নেই—আমরা আরও একটু ঘুরতে চাই। তা ছাড়া, কাল গোমুখ যাবো, ধর্ম্মশালায় ফিরে তারও ব্যবস্থা সব দেখে নিতে হবে।

গোমুখের কথা শুনেই স্বামীজি গম্ভীর হন্, বলেন, ও-বড় কঠিন পথ। আপনারা যেতে পারবেন না—বৃথা চেষ্টাও করবেন না। তার চেয়ে বরং কাল চলে আসুন এখানে—চা-টা খাবেন। দেশের সব খবর-টবর শোনা যাবে—অনেক গল্প হবে।

ভাবি তোমারি মুখে এ-কথা সাজে বটে!

মুখে বলি, আচ্ছা—চললাম।

হাত তুলে বিদায়-সম্ভাষণ জানাই। তিনিও গেট্ পর্য্যন্ত এগিয়ে দেন্। বলেন, আবার আসবেন।

ভদ্রতার প্রতিমূর্ত্তি।

হঠাৎ মনে পড়ে সহরের পাকা ব্যবসায়ীদের কথা,—কি অমায়িক কথার আড়ম্বর!

এতক্ষণ আশ্রমে আশ্রমে ঘোরার পর এখানে এসে মনের প্রশান্ত-প্রবাহে বাধা পেলো।

গঙ্গোত্রী-বাসী একটি সঙ্গীকে প্রশ্ন করলাম, স্বামীজির বহু ধনী শিষ্য আছেন বুঝি?

তিনি একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, নাঃ, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। শিষ্য কিছু আছে বটে, কিন্তু অর্থ উনি নিজেই উপার্জ্জন করেন। আজ কবছর কাঠের বেশ বড় ব্যবসা করছেন।

ব্যবসা!—শুনে চম্‌কে উঠি। উঠবারই কথা। গঙ্গোত্রীতে ব্যবসায়ী সাধু! ভাব্‌লাম, কোন্‌দিন হয়ত দেখ্‌ব,

বড়বাজারে গেরুয়াধারী জটাজুট সন্ন্যাসী দোকান খুলে বসেছে!

উত্তরদাতা পাশের জঙ্গলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, ঐ সব জঙ্গল গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে ওঁর জমা নেওয়া। ঐ দেখছেন না, মাঝে মাঝে ফাঁক রয়েছে—ও-সব জায়গায় গাছ কাটা হয়েছে। দেওদার, চীর্, পাইন গাছ,—সব দামী কাঠ। তাছাড়া, একচেটিয়া ব্যবসা। এ-সব অঞ্চলে বা গঙ্গোত্রীর পথে যত ঘর-বাড়ী তৈরি হয়—সব কাঠ সাপ্লাই করেন ইনি। এখানে আসার পথে ভৈরব-ঘাটিতে কালীকম্‌লীর ধর্ম্মশালাটি গত বছর আগুনে পুড়ে গিয়েছিল—এ-বছর নতুন ঘর তৈরি হচ্ছে, দেখেছেন নিশ্চয়,—কাঠ জোগান দিচ্ছেন ইনি। বহু টাকা করেছেন।

মনে পড়ে বটে, আসার পথে ভৈরবঘাটিতে বহু কাঠ সংগ্রহ করা আছে দেখেছিলাম। তারি উপর বসে দুরন্ত চড়াই উঠার শ্রান্তি দূর করেছিলাম, দ্বিপ্রহরের আহারও করেছিলাম। তখন ভেবেছিলাম, জঙ্গল থেকে বিনামূল্যে সব কেটে-আনা কাঠ,—সার্থক জন্ম এ গাছগুলির।

এখন জানি, সে-সবই এঁর ব্যবসার সম্পত্তি!

সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল, কিন্তু মন ঘোলাটে হয়ে উঠ্‌ল।

ঘন-সবুজ জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে দেখি। চারিদিকে বিশাল বনস্পতি। তারি মাঝে মাঝে কাটা-গাছে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে।

শ্যাম-বনানীর শ্যামল অঙ্গে নখরাঘাতের ক্ষত চিহ্ন।

১৩

গঙ্গা-স্নান সেরে তৃপ্ত মনে ফিরছি, হঠাৎ এমন সময় কোথায় যেন পা দিয়ে ফেলেছি,—ব্যবসায়ী সাধুর আশ্রম থেকে বেরিয়ে মনের এমনি সঙ্কুচিত ভাব। এ-মনোভাব কাটাবার উদ্দেশে নতুন সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপ শুরু করলাম।

একটি যুবকও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিলেন। সারা-ক্ষণে খুব অল্পই কথা কয়েছেন। এঁকে সকালেও একবার দেখেছিলাম ভাণ্ডারার সময়। সব সাধুদের

নেওয়া শেষ হলে সসঙ্কোচে সেই ফোকরের কাছে দাঁড়িয়ে নিজের আহার্য্য নিয়েছিলেন। তারপর নদীর ধারে একান্তে গিয়ে বসেছিলেন।

বছর কুড়ির উপর বয়স। সুশ্রী দেখতে। লম্বা দোহারা চেহারা। দাড়ি, গোঁফ আছে, কিন্তু এখনও বেশী বড় হবার সময় হয় নি। লুঙির মত একটা ছোট সাদা মোটা কাপড় পরনে—হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুল। শুধু পা, খালি গা —তারি উপর একটা সুতির মোটা চাদর জড়ানো। কাঁধের উপর একটা তোয়ালে—মাদ্রাজীদের যেমন প্রায়ই থাকে—সেইটিই শুধু গেরুয়া।

জিজ্ঞাসা করলাম, এখানেই থাকেন, না, যাত্রায় এসেছেন?

যুবকটি মিষ্টি হেসে ধীরভাবে বললেন, দুটোর কোনটাই নয়—আবার দুটোই খানিকটা ঠিক। এসেছি মাত্র দুদিন। এখানে থাকার উদ্দেশ্য নিয়ে। কালীকম্‌লী-ক্ষেত্রের একটা কুটি এ-পারে খালি পড়ে আছে সাধুদের থাকবার জন্যে। সেইটে এখন দেখতে এসেছিলাম, দেখেও গেলাম—এখন অনুমতি পেলে সেখানেই থেকে যাব।

কেদার-গঙ্গা ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলের খুব সন্নিকটেই কুটিটি। আমরাও দূর থেকে দেখেছিলাম। সাধনার অনুকূল স্থান।

তারপর, অতি সঙ্কোচে বললেন, আপনারা কাল সকালেই গোমুখ রওনা হচ্ছেন?

বললাম, হাঁ, কেন—আপনিও যাবেন নাকি? বেশ ত চলুন না, একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

বললেন, গোমুখ-দর্শনের ইচ্ছা ত আছে,—যেতেও নিশ্চয় হবে। তবে কালই আপনাদের সঙ্গে যাবো কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না।

শুনেছিলাম, গোমুখের যাত্রী-সংখ্যা খুবই কম। সাধারণতঃ দল বেঁধে যাত্রীরা এখান থেকে যান্। বহু স্থানে পথ নেই, পথ-চিহ্নও নেই। তাই পথ-প্রদর্শকের একান্ত প্রয়োজন। গঙ্গোত্রীর মত ছোট জায়গায় তারও সংখ্যা খুব কম। সাধু সন্ন্যাসীরা সেই কারণে যাত্রীদলে যোগ দেন। দেবার আরও একটা কারণ আছে। গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ দেখে ফিরে আসতে অন্ততঃ তিন দিন

লাগে। পথে কোথাও গ্রাম নেই—লোকের বসতিও নেই। তাই আহারাদিও মেলে না। যাত্রীদের প্রয়োজন মত নিজ নিজ আহার্য্য সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। দলে থাকলে সাধু-সন্ন্যাসীদেরও একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে আমাদের কাছেও দুই একজন যাত্রী সাধু খবর নিয়ে গেছেন, আমরা যাচ্ছি কিনা।

এ-সব জানি বলেই এঁকেও উৎসাহ দিলাম, আমাদের সঙ্গে যাবার জন্যে। ছেলেটিরও যাবার প্রবল আগ্রহ আছে, অথচ সঙ্কোচও আছে।

কথা বলার মধ্যে সঙ্গীটি মাঝে মাঝে ইংরাজি কথাও বলছিল। বিশুদ্ধ উচ্চারণ—ভাষাও শুদ্ধ। কৌতূহল হোল।

বললাম, কয়েকটা প্রশ্ন করব—কিছু মনে কোরো না। যদি বাধা থাকে উত্তর দিও না—আমিও কিছু মনে করব না।

হাসিমুখে বললে, বলুন না, সব কিছুরই জবাব দেবো।

আপনি বুঝি এই দুবার এলেন এখানে? আমার কিন্তু এই প্রথম,—হিমালয় দেখাও প্রথম। বলুন, কি বলছেন।

আমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলি, সে-ও নিঃসঙ্কোচে উত্তর দেয়।

রাজপুত। রাজপুত্রের মত চেহারাও। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্-এ পড়ছিল—পলিটিক্যাল সায়েন্স-এ। আইন-কলেজে আইনও পড়ছিল। সে-কলেজে আমিও কিছুকাল পড়িয়েছি। তবে এ আমার ছাত্র নয়,—হতে পারত। স্নেহ-সূত্র যেন দৃঢ় হয়ে উঠে।

কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কয়েকজনের নাম করল,—সবাইকে চিনি।

কথা বলতে বলতে ছেলেটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। ফেলে-আসা জীবনের কয়েকটি স্মৃতি-রেখা,—যেন পুরাণো চিঠি পড়ার আস্বাদ।

বাড়ীর কথাও বললে। স্বচ্ছল সংসার। কিন্তু সংসার তাকে কোনদিন বাঁধতে পারে নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-

শিক্ষায় আগ্রহ ছিল,—কিন্তু সে-আকর্ষণও তাকে টেনে রাখতে পারে নি।

বলতে বলতে তার কণ্ঠ হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল,—বললে, আজ একবছর আগে সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি। ঘুরেছি অনেক, শাস্ত্রগুলি পড়ছি, এখন হিমালয়ে এসেছি—নিভৃতে একান্তে বসব।

মুখের পানে তাকিয়ে দেখলাম, চোখে বুদ্ধির দীপ্তি, ওষ্ঠাধরে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, অন্তরে অটল বিশ্বাস।

সন্ন্যাসী রাজপুত্র! মনে মনে প্রণাম করলাম।

ধর্ম্মশালার কাছে চলে এসেছি। তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, কালকের যাত্রার কথা। ভাবলাম, অপরিচয়ের বাঁধন টুটল। কাল পথে যেতে যেতে দেখব তার মনের গোপন গতি। কেন সে এতো পেয়েও সব ছেড়ে এল? কি সে চায়?

কিন্তু তার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। গোমুখ-যাত্রার সময় তার খোঁজ করেছিলাম, শুনলাম, আমাদের কিছু আগেই

দুজন সাধু গেছেন—হয়ত তাঁদের সঙ্গে গেছে, পথেই দেখা হবে। কিন্তু, পরে জানলাম, তাঁদের সঙ্গেও সে যায় নি।

না-যাওয়ার কারণও অনুমান করলাম। এ-যাত্রা-পথে অপরের কাছে কোন কিছু সাহায্য নেওয়ার সংকোচ বোধ করি সে এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

আরও এক কারণ হয়ত আছে। সেদিনের সেই স্বল্প-আলাপনের অন্তরে প্রীতির সৌরভ ছিল।

তাই, সম্ভবতঃ তার সন্ন্যাসী-মন স্নেহের সামান্য স্পর্শে মায়া-ভ্রমে ভীরু বিহঙ্গমের মত পালিয়েছে।

অথচ, প্রেম মাত্রেই তো মায়া নয়।

তার ক্ষণিকের পরিচয় আমার মনে আনন্দের দীপ জেবলে দিল। সেই ব্যাপারী সাধুর অসাধু-সঙ্গের আঁধার ঘোচাল।

১৪

আমাদের গোমুখ-যাত্রার সব আয়োজন প্রস্তুত।

বিরাট্ কিছুই নয়;—যা কিছুর একান্ত প্রয়োজন, তারই আয়োজন। শুধু, খাওয়া-পরা-শোওয়ার ব্যবস্থা—কিন্তু, তাই কি কম?

সঙ্গের কুলি দুটি নেপালী। হৃষীকেশ থেকেই সাথে আছে। তাদের সঙ্গে এবার আমার অদ্ভুত ব্যবস্থা। চল্লিশ দিন হিমালয়ে কাটাবো। যেখানে খুশী যাবো, যতদিন খুশী থাকবো। হৃষীকেশ থেকে দুমাইল গিয়েও থেকে যেতে পারি, আবার হিমালয়ের কোন অজানা হিমশিখরেও একমাস কাটাতে পারি। জিজ্ঞাসা করি, সব ভেবেচিন্তে বলো—এই চল্লিশ দিনের জন্যে কত নেবে,—খাওয়া-দাওয়া সব তোমাদের, সে-সব ঝঞ্ঝাট আমি বইতে পারবো না।

তারা অনেক ভেবে বলে, বাবুজি, তাহলে একএকজনকে একশ' কুড়ি টাকা করে দিতে হবে। দেখুন, জিনিস-পত্রের দাম—

আমি কথার মাঝে ছেদ টানি। বলি, কারণ দেখানোর দরকার নেই। বেশ, ঐ টাকাই পাবে। ভালভাবে কাজ করো ত বখশিস্‌ও পাবে।

তারা খুশী হয়ে কাজে লাগে।

কাজ শুধু মোট বওয়া। কিন্তু, সব সময়ে সব কিছু কাজে এগিয়ে আসে সাহায্য করতে—স্বেচ্ছায়, হাসি-মুখে।

আশ্চর্য্য তাদের শারীরিক শক্তি। এক মণ ভারী বোঝা পিঠের উপর নিয়ে স্বচ্ছন্দে চড়াই উঠে এসেছে।

তাদের পথ-চলার একটা ছন্দ আছে, আনন্দও আছে। দেখতেও আনন্দ।

সেবা তাদের শুধু কর্ত্তব্যই নয়—ধর্ম্ম। সমস্ত শক্তি দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে পরকে পরম সেবা করার এরা জীবন্ত উদাহরণ।

এদের বিশ্বাস করে কখনও ঠকতে হয় নি। কেউ ঠকেছে

বলে শুনিও নি। মানুষ যে অবিশ্বাসী হতে পারে—এইটেই এদের কাছে অবিশ্বাস্য।

এরা অতি দীন-দরিদ্র। তবুও আত্ম-মর্য্যাদার মান জানে। তাই, দারিদ্র্যও এদের গৌরব,—দীন হলেও হীন নয়। নদীর জলে স্নানের কালে, ঝরণার ধারে বা গাছের ছায়ায় রাঁধার সময় এদের সাজ দেখেছি। উলঙ্গই বললে চলে, একটি কৌপীনমাত্র সার। এরাও হিমালয়ের এক শ্রেণীর যথার্থ সাধু।

হাত জোড় করে পায়ের কাছে দুজনে এসে বসল। কি যেন বলতে চায়, অথচ এদের সঙ্কোচ জাগে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে রে?

আস্তে আস্তে বলে, বাবুজি, এ-তিন দিন আমাদের খাওয়া-দাওয়া কি হবে? গোমুখ ত আমরা কখন যাই নি। শুন্‌ছি—ওদিকে গ্রাম বা দোকান নেই—কোন খাবার মেলে না।

বললাম, এই ব্যাপার! এর জন্যে ভাবনা? এ কদিন

গঙ্গোত্রী এসেও ত তোদের খাওয়ার কথা ভাবতে হয় নি —যদিও খাবার ব্যবস্থা তোদের নিজেদেরই করার কথা,— মনে আছে ত?

দুজনেই হাসে, কপালে হাত ঠেকায়। বলে, জি বাবুজি।

বললাম, তবে ও-কথা ভাব্‌ছিস্‌ কেন? যদি আমাদের খাবার মেলে, তোদেরও নিশ্চয় মিলবে। আর যদি আমরা খেতে না পাই, তোরাও পাবি না।

ওরা আবার হাত তুলে নমস্কার করতে থাকে। বলে, এ ঠিক্‌ আছে, বাবুজি।

কিন্তু, এদিকে মালের বোঝা ভারী হয়ে গেছে—যে কজন দলে আছে, সবারই খাবার নিতে। উপায়ই বা কি?

ভরসা এইটুকু, ফেরবার পথে এ-সব আহার্য্যের বোঝার ভার লাঘব হয়ে, অন্যত্র ভার বাড়াবে!

কুলিদের গোমুখের শীতে যাতে অসুবিধা না হয়, তাই ধর্ম্মশালা থেকে কয়খানা কম্বলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিড়িও নেওয়া হয়েছে তাদের জন্যে। শীতের মধ্যে একটু মৌতাত পায়, পথ-চলার ক্লান্তিও হরণ করে, শুনি। হবেও বা।

শুধু বলি, বাপু, রাত্রে যদি একঘরে শুয়ে থাকিস্—ওটা খাস্ নে। ওর গন্ধ সইতে পারি না—ভাল সিগারেটের গন্ধে কষ্ট কম। কিন্তু, তা পাচ্ছিস্ কোথায়!

সব কথা বোঝে কিনা বুঝি না।

শুধু দেখি, গভীর কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়, জোড়হাতে নমস্কার করতে থাকে।

সকালে সকলে একসঙ্গে রওনা হলাম।

বহুদিন ধরে শুনে এসেছি,—গোমুখের পথ—দারুণ দুর্গম। সাধু-সন্ন্যাসীরা যায়,—নইলে যাত্রীদের মধ্যে খুব কমই যেতে সাহস পায়। আমরা সাধুও নই, সন্ন্যাসীও নই; অসীম সাহসের অধিকারীও নই। তবুও যাবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা। দুর্গমতার কাহিনী, কেন জানি না, মনে ভয় জাগায় না, আকর্ষণই করে।

মনে পড়ে, যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গাঃ বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ—

কিন্তু তখনি মনে হয়, ঠিক তাই বা কই? এ-তো বিনাশের কথা নয়। এ-যেন ঈপ্সিত-প্রাপ্তির আশার আলো.—প্রিয়-মিলনের মধুর অভিসার।

তাই, মনে ভয়ের ছায়া নেই, আশা-আনন্দের দীপ্তি রয়েছে।

কিন্তু, ফুলের কাঁটার মত এই আনন্দেও ব্যথা অনুভব করি।

মা-র বড় ইচ্ছা ছিল আসবার। আনি নি,—কেন না, তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙেছে। এ-পথে ডান্ডী চলে না, তাই তাঁর পক্ষে সব পথ হেঁটে যাওয়া অসম্ভব।

তিনি এলে খুশী হতেন, তৃপ্তি ও শান্তি পেতেন,—জানি বলেই মনে ব্যথা জাগে।

তাই, যাত্রা-মুখে তাঁকে স্মরণ করি, প্রণাম করি আর বলি,

আমার এ-চোখ দুটি তোমারি দেওয়া, এ-চোখে তুমিই দেখো। আমার দেখার সব আনন্দ, সব তৃপ্তি, সব পুণ্য তোমারি হোক্। তোমারি তৃপ্তিতে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি

মনে মনে মাকে প্রণাম করি, মন্দিরে গঙ্গাদেবীর মূর্ত্তি মায়েরই মূর্ত্তিকে স্মরণ করায়।

হঠাৎ, তাকিয়ে দেখি, ওপারে সেই মহাত্মা সাধু গঙ্গাস্নান সেরে চলেছেন।

আশার আলো আরও প্রোজ্জ্বল হয়। মনে হয়, প্রভাতে উঠিয়া ও-মুখ হেরিনু দিন যাবে মোর ভালো।

পুল পার হয়ে গঙ্গার অপর পারে এলাম।

গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ যাবার কোন বাঁধাধরা নির্দ্দিষ্ট পথ নেই। যতদূর সম্ভব, গঙ্গার ধারা ধরে যেতে হবে। সাধারণতঃ গঙ্গোত্রীর অপরপার দিয়েই যেতে হয়। যদি কোন বছর সে-পার দিয়ে চলাচল অসম্ভব হয়ে উঠে, তখন এ-পার দিয়ে যাতায়াতের চেষ্টা হয়। কিন্তু,

এ-পারের পাহাড়গুলি অনেক জায়গায় একেবারে জলের ভিতর থেকে উঠেছে—তাই চলাচল আরও কঠিন।

এ বছর আমাদের আগে আরও একটি দল অপরপার ধরেই গিয়েছিলেন, তাই আমরাও সেই পথই ধরেছি।

সাধুদের আশ্রমগুলি ছাড়িয়ে এলাম। এ-টুকু জানা পথ, পথও আছে।

গঙ্গার অপরপারে কিছু দূরে গঙ্গোত্রীর মন্দির, ঘরবাড়ী—এমন কি লোকচলাচলও দেখা যাচ্ছে।

এইবার দাঁড়িয়ে দলের হিসাব নেওয়া গেল।

১৫

কলিকাতা থেকে এসেছি আমরা তিনজন।

হৃষীকেশ থেকে পেলাম দুই কুলি।

রান্নার ও কাজকর্ম্ম দেখার জন্যে সঙ্গে এসেছে উত্তর-কাশীর একটি ছেলে। ভরত সিং—ওরফে ভর্ত্তু। করিৎ-কর্ম্মা, চালাক-চতুর; সম্পূর্ণ বিশ্বাসী—সেটা এই হিমালয়েরই অবদান। আমাদের খুচরা জিনিসপত্রের থলিটি সে পিঠে বয়—ফ্লাস্ক, ক্যামেরা, বাইনোকুলারও। ধর্ম্মশালায় পোঁছুবার দুই-এক মাইল আগে ত্বরিত-গতিতে চলে যায়, জায়গা দেখে ঘর বেছে পরিষ্কার করে রাখে; কখন কখন রান্নাও চড়িয়ে দেয়। মনে স্ফূর্ত্তি রাখে, কাজে আনন্দ পায়। চমৎকার ছেলে।

পাণ্ডার ছেলেও চলেছে। সে-ও ছোকরা, তবে যাত্রীর কাছে পাণ্ডার যে একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে—সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ। কেবলি এসে খোঁজ নেয়, আর কি সেবায় লাগতে পারি, বাবুজি? বেশ ভাল করে আর একবার চা তৈরি করিয়ে আনি?

চা ত নয়। তার এক অপরূপ স্বাদ। অনেকখানি দুধ, অনেকখানি চিনি—তবেই হোল ভাল চা। আর 'বেশ ভাল' অর্থে হোল—তাতে লবঙ্গ-দারচিনি সিদ্ধ, এলাচের গুঁড়ো দেওয়া। হাসিমুখে বলে, বাবুজি, এ 'এস্-পেসাল্' চা আছে—'বড় বড়িয়া'!

অদ্ভুত লাগলেও, খারাপ নয়। খেয়ে শরীর গরম বোধ হয়।

সে-ও চলেছে সঙ্গে। গোমুখ পথে তারও এই প্রথম যাত্রা।

গঙ্গোত্রী-বাসী এক সাধুও চলেছেন। নাগাও নন্, মৌনীও নন্। গেরুয়া বাস; একটা মোটা কম্বলও নিয়েছেন। কথাবার্ত্তায় ভালই বোধ হয়।

শুনলাম, আরও দুজন সাধু এগিয়ে গেছেন। পথে দেখা হবে।

সকলেই এ-পথের নবীন যাত্রী। শুধু পথ-প্রদর্শকটিরই পরিচিত পথ। গঙ্গোত্রীর লোক। চেহারা দেখেই চম্‌কে উঠলাম। বেঁটে-খাটো ছোট্ট মানুষ। রোগা লিক্‌লিক্ করছে। পরনে জুতা, পায়জামা, গায়ে ওভার-কোটের তলায় ওয়েষ্ট-কোট। প্রৌঢ় বয়স। মুখে হাসি নেই—স্ফূর্ত্তিরও কোন লক্ষণ নেই। অথচ, নাম শুনলাম শ্যামসুন্দর। তার চেহারা দেখেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বাপু, পারবে ত যেতে?

শুনে বোধ করি অপমান বোধ করলে। বললে, বহুবার গেছি ওখানে। এ-বছরেও ত এই কদিন আগে যে-দল গেল—তার সঙ্গে ছিলাম। শরীরে আমি কম তাগদ্ রাখি? আপনাদের ঐ লম্বাচওড়া কুলিদের চেয়ে ঢের বেশী।

তাদের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টি হানে। নিজের পিঠের উপর তার নিজেরই কম্বলের ছোট্ট বোঝাটি সোজা করে নেয়।

তারপর গম্ভীর মুখে বলে, চলুন বাবু, দেরী করবেন না। সামনে অনেক পথ, ভারি চড়াই—সন্ধ্যার আগে ডেরায় পেঁছুতে হবে।

উত্তরে বলি, বাপু, তোমার সঙ্গে ত আমরা তাল রেখে চলতে পারব না। তুমি জোয়ান্ আদ্মী। আমরা ধীরে ধীরে চলব—যেমন যাচ্ছি। পেঁছুতে না পারি—পথের ধারেই পড়ে থাকব। যদি বাঘ-ভালুক আসে, খেয়েই ফেলবে। যাত্রীকে সেবা করা যদি পুণ্য হয়, যাত্রীকে উদরে পুরে সেবা করলে নিশ্চয় আরও পুণ্য হবে!

নিজের প্রশংসাটুকু বুঝে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চলে।

এরই আর এক রূপ দেখেছি তার কিছু পরেই।

একটা বড় চড়াই ওঠা হয়েছে। সবাই ক্লান্ত, সে-ও শ্রান্ত। হবারই কথা।

দেখি, কুলিদের বোঝার উপর তার নিজের কম্বলের ছোট্ট বোঝাটিও চাপিয়ে দিচ্ছে। কুলিরা আপত্তি করছে, করার যথেষ্ট কারণও আছে। তাদের নিজেদের বোঝা বেশ ভারী, তবুও তাই নিয়ে তারা ধীরে ধীরে চলেছে। তার উপর আরও ভার চাপ্‌লে—তা সে যত সামান্যই হোক্‌—তাদের বিরক্ত হবারই কথা।

তারা রুষ্ট হয়ে আপত্তি জানায়, বলে, বাবুজিদের কাজ করতে এসেছি—তোমার মোট বইব কেন?

লোকটি বাস্তবিকই ক্লান্ত হয়েছে। অনুনয়ের সুরে কুলিদের বলে, ছোট্ট বোঝা, এইটুকু নিয়ে নাও ভাই।

কুলিরা ছাড়ে না, ছোট্ট বোঝা তা তুমি নিজেই বও না!

আমি তার অসহায় অবস্থা দেখে কুলিদের নিতে বলি। তারা নেয়ও। নেবার সময় হাসতে হাসতে তাকে বলে, এবার চলে এসো, তুমি নিজেও এসে পিঠে বসে পড়ো! শরীরে খুব তাগদ্ রাখো, নয়!

তার শক্তিমত্তার দম্ভকে ব্যঙ্গ করে।

১৬

পথেরও স্রষ্টা আছে। তা সে মানুষই হোক্, কি পশুই হোক্। বারবার একই স্থান দিয়ে চলাচলের ফলে পায়ের তলায় পথ জেগে উঠে। আর মানুষ যদি হাতে তৈরি করে ত কথাই নেই।

এখানে দুটোর কোনটাই খাটে না। রাস্তা-তৈরির প্রশ্ন উঠে না, কেন না, সারা বছরে এত কম লোকই যায় যে সেই কয়জনের সুবিধার জন্যে এত অর্থব্যয় করবে কে ও কেন?

তাছাড়া, অর্থ-ব্যয়ও যদি হয়, প্রকৃতির প্রকোপে পথ

থাকতে পারে না। পাহাড় ধ্বসে পড়ে, জলের ধারা নামে, বরফে ঢাকা পড়ে, বরফ গল্‌লে পাহাড়ের আকৃতিরও পরিবর্ত্তন হয়। মানব-সৃষ্ট ভঙ্গুর পথের এত আঘাত সইবার শক্তি নেই।

লোক-চলাচলেও পথ-সৃষ্টির আশা নেই। সামান্য কয়েক-জনের চকিত চরণ-পাতে পথের চিহ্ন জাগে না। আর, সে চিহ্ন পড়বেই বা কোথায়? নদীর ধারে বালির উপর, অথবা বনের ভিতর মাটির পরে চরণ-রেখা আঁকা সম্ভব বটে, কিন্তু এখানে যে প্রায়ই পাথর। মানুষ ত দেবতা নয় যে পাষাণের বুকেও চরণ-চিহ্ন ফুটে উঠবে।

অনেকদিন আগেকার কথা মনে জাগে।

চিত্রকূট বেড়াতে গেছি। রামায়ণের সেই স্মৃতি-ভরা চিত্রকূট। বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যে সব ঘুরে ফিরে দেখছি। রামায়ণের কত কাহিনী আবার নতুন করে শুনছি। এখানে এই হয়েছিল, ওখানে ঐ ঘটেছিল। এক জায়গায় প্রকাণ্ড একটি সমতল পাথর;—কে যেন ধরণীর দেহ পাথরে বেঁধে দিয়েছে। তারই উপর দাঁড়িয়ে আছি। এখানকার স্থান-মাহাত্ম্যের কাহিনী শুনছি।

এইখানেই 'ভরত-মিলাপ' হয়েছিল—রামচন্দ্রজির সঙ্গে ভরতের মিলন। সীতাদেবী ছিলেন, লক্ষ্মণ ছিলেন, আরও সব কে কে। বনের পশু-পক্ষীরাও এই মধুর মিলন দেখতে এসে দাঁড়িয়েছিল। বিরহবিধুর দুই ভাই-এর মিলন—উভয়ে আলিঙ্গন করে স্নেহপাশে আবদ্ধ হয়েছিলেন;—'ভেটত ভুজ ভরি ভাই ভরত সো।' এই করুণ দৃশ্য দেখে সবারই চোখে ধারা বয়েছিল। পাষাণও দ্রবীভূত হয়েছিল। তাই পাষাণের বুকেও সবারই পদ-চিহ্ন পড়েছিল।

চিত্রকূটবাসী একজন দেখাচ্ছিলেন,—এই দেখুন, এইটে রামচন্দ্রজির, এইটে ভরতের,—এই এদিকে সীতাদেবীর; এই দেখুন সব পাখীর পায়ের ছাপ, এই এখানে সব বনের পশুর।

শুনছি আর দেখছি। আশ্চর্য্য লাগে, পাথরের উপর এই অদ্ভুত চিহ্নগুলি। মানুষের তৈরি নয়, দেখলেই বোঝা যায়। কোন স্বাভাবিক প্রকৃতিগত কারণে পাথরের উপর বিচিত্র এই সব রেখা। কোন কোনটি মানুষের পায়ের ছাপের মতই লাগে, কোনটি বা পশু-পক্ষীর মনে হয়।

বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞের মত নিশ্চয় বিজ্ঞানসম্মত এর কোন কারণ নির্দ্দেশ করবেন। তা করুন, বাধা নেই।

তবে, সেই অপূর্ব্ব আবেষ্টনীর মাঝে এই বিচিত্র রেখা-গুলির সাহায্যে কারও কল্পনা-বিলাসী বিশ্বাসী মন যদি রামায়ণের সেই করুণ কাহিনীর আলেখ্য এঁকে ক্ষণিক তৃপ্তি পায়, তাতেই বা ক্ষতি কি!

সেই এক দেখেছিলাম, পাথরের বুকে সব পদ-চিহ্ন!

এখানে গোমুখের পথে সেই দেবতাদের চরণ-চিহ্নও নেই, মানুষের পায়ের ছাপও নেই।

তবে, পায়ের চিহ্ন না থাকলেও হাতের চিহ্ন রেখে যাবার প্রয়াস আছে। মাঝে মাঝে পূর্ব্বগামী যাত্রীরা পাথরের উপর ছোট ছোট কয়েকটি পাথর বসিয়ে বা সাজিয়ে রেখে যান্—দেখলেই বোঝা যায় মানুষের হাতের স্পর্শ। পরের যাত্রীরা তাই দেখে অনেক সময় চলেন।

এ যাত্রা-পথে এই একমাত্র সামান্য পথ-নির্দ্দেশ।

১৭

সেই পথেই চলেছি আমরা।

কখন গঙ্গার ধারার খুব কাছ দিয়ে, কখন বা পাড়ের কিছু উপর দিয়ে। দুই কূলেই গগনস্পর্শী গিরিশ্রেণী। ও-পারের পাহাড়ের চূড়া দেখা যায়। যেন তেজোদীপ্ত ব্রাহ্মণ। তাম্র-কান্তি দেহের ঊর্দ্ধাঙ্গে তুষার-শুভ্র উত্তরীয়। তুষার-নিঃসৃত নির্ঝরিণীগুলি যেন বুকের উপর যজ্ঞোপবীত।

এ-পারের পাহাড়ের চূড়া মাথা তুলেও দেখা যায় না।

হঠাৎ সামনে দেখি বিশাল পাথরের স্তূপ গতি-পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। জলের ভিতর থেকে সোজা উঠেছে পাহাড়ের মাথার দিকে। সে-সব পাথর বেয়ে উঠার ক্ষমতা আমাদের নেই। গাইড্-এর শরণাপন্ন হই। দিক্-ভ্রম হয়নি ত?

জিজ্ঞাসা করি, যাবো কোন্ দিক দিয়ে?

ইতিমধ্যে সে একটা পাথরের একটু উপরে উঠে দাঁড়িয়েছে। একটা পা বেঁকিয়ে পাথরের উপর রেখেছে, কোমরে একটা হাত, অপর হাত দিয়ে দেখাচ্ছে—ঐ! ঐ ধার দিয়ে যেতে হবে, উঠে আসুন এই পাথরটার পাশ দিয়ে সাবধানে।

কলোম্বাসের আবিষ্কারের উচ্ছ্বাস!

পাথরের পাশ দিয়ে গিয়ে একটু উঠেই দেখলাম—প্রকৃতির অভিনব পথ-সৃষ্টি। দুইটি বিশাল পাথর, মাঝখানে সামান্য ফাঁক আছে, একটু উপরে মাথায় মাথায় স্পর্শ করেছে। এইভাবে একটি সুড়ঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। সুড়ঙ্গটি ধীরে ধীরে উপর দিকে উঠে গেছে। এদিক থেকে তাকালে উপরে অপর দিকে সুড়ঙ্গের আর একটি মুখ দেখা যায়। ভিতরে নানান্ আকারের ছোট-বড় পাথর—তারি উপর চীর্‌গাছের কয়েকটি শুক্‌না গুঁড়ি পড়ে আছে। সেই পাথর ও গাছের উপর দিয়ে যেতে হবে। এ-মুখে যেখানে দাঁড়িয়ে দেখছি তার চার-পাঁচ হাত দূরেই গঙ্গার প্রবল প্রবাহ। পাথরে গতিরোধ হওয়ায় উচ্ছলিত তরঙ্গে জলকণার ফোয়ারা সৃষ্টি করছে। আমাদের মুখে চোখে তার সজলস্পর্শ সানন্দে অনুভব

করছি। মকর-বাহিনী যেন তাঁর বাহনের পুচ্ছ-তাড়নায় হিমালয়কে সরিয়েই দিতে চান্।

তবুও, এই উগ্রমূর্ত্তির পাশে সুড়ঙ্গের পথটুকু বিচিত্র হলেও ভয়াবহ নয়। পদস্খলনের আশঙ্কা থাকতে পারে, কিন্তু তাতে গঙ্গাপ্রাপ্তির পুণ্যলাভের আশা নেই। পড়লে সেই সুড়ঙ্গের মধ্যেই তিন-চার হাত নীচে পড়তে হবে,—তাতে হাত-পা ভাঙার হয়ত সম্ভাবনা—তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু তাও হয় না।

এক সঙ্গীর ডাকে তাকিয়ে দেখি, সুড়ঙ্গের ঠিক পাশেই একটি প্রকাণ্ড গুহা। গুহার ভিতর শেষ দিকে পাহাড়ের গায়ে বেদীর মত একটি উঁচু পাথর। তারই উপর পা ঝুলিয়ে সঙ্গীটি বসেছেন—যেন অজন্তার গুহার মাঝে বুদ্ধ-মূর্ত্তি। সেখান থেকে গঙ্গার ধারা অতি সুন্দর দেখায়। গুহার ভিতরটিও পরিষ্কার। মনে হয়, কোন সাধুর সাধনার স্থান ছিল।

সুড়ঙ্গ-পথ পার হয়ে আবার পাহাড়ের গা দিয়ে পথ। গঙ্গার ধারেই একটি ছোট জঙ্গল। সবই দেওদার গাছ—মাঝে মাঝে ভূর্জ্জপত্র। নানান্ রঙের পাখী ঘুরছে।

জঙ্গল পার হয়েই এক বিচিত্র আবেষ্টনীর মধ্যে এসে পৌঁছুলাম। চারিদিকে কেবলি নানান্ আকারের গোলাকৃতি পাথর। যেন পাহাড়ের মাথার উপর থেকে শুধু গোল পাথরের এক বিপুল স্রোত নেমে এসে গঙ্গায় গিয়ে পড়ছিল, এমনি সময়ে কার যেন শাসনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। পাথরগুলির অপূর্ব্ব বর্ণবিন্যাস। সাদা, গোলাপী অথবা হলুদ রঙের বড় বড় গোল পাথর—সারা অঙ্গে কালো কালো বিন্দু। কে যেন কলমের কালি ছিটিয়ে দিয়েছে!

একটা পাথর থেকে আর একটা পাথরের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে হচ্ছে। এমনি করেই এই প্রস্তর-প্রান্তর উত্তীর্ণ হতে হবে। প্রথমে আশঙ্কা হয়েছিল হয়ত মসৃণ পাথরের উপর পা পড়লেই পিছ্লিয়ে যাবে,—কিন্তু, তা কোথাও যায় নি। দ্বিতীয় আশঙ্কা, দেহের ভার পেলেই নিশ্চল পাথর হয়ত সজাগ হয়ে হেলে উঠবে—গতির বেগে হয়ত পদচ্যুতি ঘট্বে। সে-রকম দুরন্ত পাথরের সঙ্গে মাঝে মাঝে পরিচয় ঘটছে, তাই স্বচ্ছন্দে চলার ছন্দঃপতনও হচ্ছে। সতর্কগতিতে পাথরের ভার-সাম্য বিচার করে এগিয়ে চলেছি। কিন্তু, অল্প সময়েই দেখি, পাথরগুলির সঙ্গেও যেন নিবিড় পরিচয় হয়ে

যায়, দেখলেই চেনা যায়—কার উপর নির্ভয়ে দেহ-ভার দিয়ে বিশ্বাস করতে পারব।

গাইড্ বলে, বাবুজি, গঙ্গোত্রীর পথের প্রধান বৈচিত্র্য হোল এই সব পাথর, কেদার-বদরীর পথে এমন নেই—কেবলি লাফিয়ে লাফিয়ে এখানে যেতে হবে। এরকম অনেক জায়গাতেই পাবেন।

সঙ্গী একজন বলেন, তাতে ক্ষতিও নেই, ভয়ও নেই। বরং, বেশ ভালই তাড়াতাড়ি চলা যাচ্ছে—লাফিয়ে চলায় স্পীড্ বাড়ছে।

হেসে বলি, লাফিয়ে চলার অভ্যাসটি যাবে কোথায়?

সবাই সানন্দে এগিয়ে চলি। কিন্তু, কোন্‌দিকে যাচ্ছি বা যেতে হবে বুঝি না। কিছু নীচেই গঙ্গার স্রোত বয়ে চলেছে। শুধু বুঝি, ঐ গঙ্গারই উৎস-মুখে চলেছি। কিন্তু নদীর গতি-পথ সরল রেখায় ত চলে না। উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণীর প্রাচীর ভেদ করে পথ খুঁজে খুঁজে পার্ব্বত্য নদী উদ্দাম বেগে ছুটে চলেছে। চলেছি হয়ত উত্তর মুখে, গাইড্ দেখায় পূর্ব্বদিকে বরফ-ঢাকা

পাহাড়ের চূড়া, বলে, বাবুজি, ঐ! ঐ পাহাড়ের পিছন দিয়ে আমরা যাবো।

মনে পড়ে, গঙ্গাসাগর যাবার কথা। স্টীমারে গঙ্গার উপর দিয়ে চলেছি হয়ত দক্ষিণ মুখে। সারেঙ্ দেখায় পশ্চিম দিকের আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী, বলে, ও-ধার দিয়ে স্টীমার আস্ছে—নদী গেছে ঐ দিক্ দিয়ে ঘুরে!

আবার মনে পড়ে, উড়ে চলেছি প্লেনে আকাশ-পথে। নীচে তাকিয়ে দেখতে থাকি, বড় বড় নদীর গতি-পথ—সবুজ পৃথিবীর বুকে বালুকা-ময় স্বর্ণ-রেখা—সর্পিল ভঙ্গীতে এঁকেবেঁকে চলেছে।

নদীর বিচিত্র গতি।

চারিদিকে অচল হিমাচলের ধ্যান-স্তিমিত মূর্ত্তি, তারি মাঝে সচল নদীর উচ্ছল জলোচ্ছ্বাস।

দেবাদিদেব মহাদেবের শিরশীর্ষের জটাজালে এই-ই বুঝি বা গঙ্গাবতরণ!

গঙ্গার অপর পারে দৃষ্টি পড়ে। ধারার কিছু উপরেই সামান্য সমতলক্ষেত্র। তারি একধারে ছোট একটি গুহা। গুহার বাহিরে ছোট ছোট কয়েক সাজানো পাথর মানুষের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়।

গাইড্ বলে, এক বড় সাধুর আশ্রম ছিল। একাই সাধনা করতেন ওখানে। যাত্রীদের মধ্যে ক্বচিৎ কখনো কেহ কেহ এসে দর্শন করতেন। মহাপুরুষ ছিলেন। আজ কিছু-কাল হোল

এখন, শূন্য আশ্রম ভাঙা মত পড়ে আছে।

এই নিভৃত-বাসের মধ্যে তিনি কি পেয়েছিলেন, কি দিয়ে গেছেন, তার সন্ধান কে দেবে, তাই ভাবি।

১৮

ধীরে ধীরে সাবধানে এগিয়ে চলেছি। পূর্ব্বগামী যাত্রীদের রেখে-যাওয়া সাজানো ছোট ছোট পাথরগুলির উপর দৃষ্টি আছে। গাইডের ডাকে চমক লাগে।

তাকিয়ে দেখি পাহাড়ের উপর দিকে সে উঠে গেছে অনেকখানি।

আমরা গঙ্গার তীরের দিকে নেমে চলেছি। দু-দিকেই সাজানো পাথরের পথ-নির্দ্দেশ।

গাইড্ বলে, উপর দিক দিয়েই যেতে হবে—নীচের পথে পুরাণো চিহ্ন—ওদিকে এখন পথ নেই।

অতএব, উপর ঠ্তে হয়।

পাহাড়ে ওঠার স্বাভাবিক কষ্ট ত আছেই। ক্লান্তি বোধ হয় আরো এই ভেবে যে শেষ পর্য্যন্ত গঙ্গার ধারে ত নামতেই হবে, তবে কেন এই অকারণ আরোহণ। কিন্তু, পাহাড়-পথে চলার এই-ই ত রীতি। তাই সন্তর্পণে অতি ধীরে উঠতে থাকি। উপর থেকে নদীর ধারা-পথ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর দেখাতে থাকে।

সঙ্গের কুলি দুটি দলের সঙ্গে নেই দেখে চিন্তিত হই। কোন্ সময়ে যূথভ্রষ্ট হয়েছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা হয়। শিস্ দিয়ে গাইড্ ইসারা করে—পাহাড়ে তার

প্রতিধ্বনি ওঠে—তবুও তাদের কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

সব মালপত্র তাদের কাছে। সে-সব হারাবার কিছুমাত্র আশংকা নেই। কিন্তু, তারা পথ হারালে তাদের বিপদ আছে, ভাবি। বিরাট পাহাড়গুলির মাঝে নগণ্য দুটি মানব-শিশু। খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, তাই চেষ্টাও বৃথা। অগত্যা, তাদের পথ-চেনার সহজ বিচার-বুদ্ধির উপর ভরসা রেখে আমরা এগিয়ে চলি।

পাথর ডিঙিয়ে চলা আপাততঃ শেষ হয়েছে। পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে চলেছি। সাম্‌নেই বিরাট ধ্বস নেমে গেছে বহু নীচে নদী পর্য্যন্ত। পাহাড়ের গায়ে পা রাখার মত স্থানও নেই, তাই এগোবারও উপায় নেই। গাইড্ থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেছে। সবাই বুঝতে পারি ভুল পথে চলে এসেছি। নদীর দিকেই নেমে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু, এখন এখান থেকে বহু নীচে নদীর দিকে তাকাতে মাথা ঘোরে, সোজা নামতে পারব কিনা সন্দেহ জাগে।

অযথা এতখানি পাহাড়ে ওঠায় সময়ও লেগেছে, শ্রান্তিও

হয়েছে। গাইড্-এর উপর রাগ ও বিরক্তি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু, আশ্চর্য্য, সে মনোভাব আসে না। সকলেই সানন্দে সব কিছু মেনে নিই। কারো উপর দোষারোপ করি না। ভাবি, এ-যেন স্ব-কৃতকর্ম্মের ফল। এই পথিক-জীবনে এমনি বিপর্যয় যেন স্বাভাবিক পর্য্যায়। এতে চঞ্চল বা বিক্ষুব্ধ হলে এখানকার শান্তি-ময় জীবনধারায় অশান্তির সৃষ্টি করবে। অন্তরে বিশ্বাস রাখি, যে মহান্ আকর্ষণ এখানে এনেছে, সে-ই ঠিক গন্তব্যে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সকলেই হাসিমুখে প্রকৃতির বিরাট্ শক্তিকে উপলব্ধি করি, তারি মাঝে পথের কাণ্ডারীর সন্ধান করি।

বহু নীচে গঙ্গার কিনারায় বিক্ষিপ্ত নিশ্চল পাথরগুলির মধ্যে ছোট্ট দুটি সচল জীবের ইঙ্গিত পাই। সবাই এক-দৃষ্টে তাকিয়ে দেখি। আমাদের কুলি দুটি! এ-পথে নতুন হোলেও তারা ঠিকই গেছে। এখন আমরা ভুল-পথে আট্কে গেছি দেখে তারা বোঝা ফেলে ছুটে এগিয়ে আসছে আমাদের সাহায্য করতে।

কি করে যে তারা পাহাড়ে উঠে আমাদের কাছে চলে এল

বিস্ময় লাগে! উঠবার পথ নেই, পা রাখবার স্থান নেই। হাতে ভর দিয়ে কোথায় পা রেখে দেখতে দেখতে উঠে এল। মুখে অভয় বাণী। বলে, বাবুজি, হাত ধরুন, নেমে আসুন, কোন ভয় নেই।

সত্যিই মনে কোনও ভয় রাখি না। নিশ্চিন্ত মনে নির্ভয়ে তাদের হাত ধরি। দেখতে দেখতে নীচে নেমেও আসি।

গঙ্গার ধারে পাথরের উপর ক্ষণিক বিশ্রাম করে আবার পথচলা শুরু হয়।

নদীর তীরে বড় বড় পাথর। তারই উপর লাফিয়ে লাফিয়ে এসে ক্লান্ত হলেও আবার পাশের পাহাড়ে ওঠা আরম্ভ হোল।

একটু উঠেই জঙ্গল। চারিদিকে শুধু ভূর্জ্জপত্রের গাছ। বার্চ্চ ট্রি (Birch Tree) মাটি থেকে একটু উঠেই ডাল-পালা বিস্তার করেছে। আঁকাবাঁকা শাখা। সবুজপাতার মাঝে সাদা সাদা ডালগুলি,—গাছের গুঁড়িগুলিও সাদা। চারিদিকে সাদা রঙের দীপ্তি ছড়িয়েছে। গাছের ছাল টেনে তুললেই পাক খেয়ে খুলে আসে। মসৃণ কাগজের

মত। যত টেনে তোলা যায় পাকের পর পাক খোলে। ডালের ক্ষত অঙ্গ রক্তাভ হয়ে উঠে। টেনে তোলা ছালের রঙ্‌ও রাঙা হয়ে আসে। গাছের একটা নীচু ডালের উপর পা ঝুলিয়ে বসে একজন সাথী সেই ভূর্জ্জপত্রের উপর ফাউণ্টেনপেন্ দিয়ে চিঠি লেখেন।

গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীর দিকে ভূর্জ্জপত্রে লেখার প্রচলন এখনও কিছু কিছু আছে। জিনিসপত্র জড়িয়ে নেবার কাজেও এর ব্যবহার প্রচুর। আমাদের দেশে যেমন কলা বা শালপাতায় খাওয়ার প্রথা আছে, এখানে ভূর্জ্জপত্রেরও তেমনি ব্যবহার হয়।

ভূর্জ্জপত্র!—নাম শুনেই যেন কোন্ প্রাচীন যুগে মন চলে যায়।

তারই বিচিত্র বনানীর প্রান্তে বসে আমাদের দ্বিপ্রহরের আহার।



গঙ্গার তীর থেকে অনেকখানি উঠে এসেছি। তাই জলের অভাব। গাইড্ বলে, কোন ভাবনা নেই, কাছেই ঝরণা আছে, পাত্র দিন্—জল আন্‌ছি।

পাত্র নিয়ে একটা কুলির সঙ্গে গেল, কিন্তু ফিরতে আধ ঘণ্টার উপর দেরী হোল। বলে, ঝরণায় জল নেই, সব বরফ হয়ে আছে, বরফ ভেঙে গলিয়ে আনতে দেরী হোল।

আহার্য্য,—সঙ্গে-আনা রুটি, আলুসিদ্ধ ও চুর্‌মা। চুর্‌মা—ঝর্‌ঝরে মোহনভোগের মত, সুজির বদলে আটার তৈরি। একবার তৈরি করলে তিন-চার দিন রেখে খাওয়া যায়—নষ্ট হয় না।

যা কিছু খাবার ছিল সকলে একসঙ্গে ভাগ করে খাওয়া হোল। কুলিদের বেশী করে দিই, বলি, তোমরা ভার বইছ তাই ভাগ বেশী পাবে।

খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম। বিশ্রামে সুখ থাকলেও, সাম্‌নে পথ পড়ে থাক্‌লে সে-বিশ্রামে স্বস্তি নেই। তাই, আবার যাত্রা শুরু করি। খাওয়ার পর পথ-চলায় শরীর ভারী বোধ হয়। কিন্তু, একটু চলার পর গতির ছন্দ আবার ফিরে আসে। দুপুরের রৌদ্রের উত্তাপ তেমন বোধ হয় না। হিম-শীতল বাতাসে বরং শীতই লাগে। বিকালে রাত্রি-বাসের আবাসে এলাম।

ধর্ম্মশালা। পাথরের একতলা বাড়ী। খানচারেক ছোট ছোট ঘর। মেঝেতেও পাথর-বসানো—অসমতল। শুধু কম্বল বিছিয়ে শোওয়া বিশেষ কষ্টকর। নীচে থেকে ঠাণ্ডা ত ওঠেই, পাথরও বিঁধতে থাকে—শরশয্যার কথা স্মরণ করায়।

কুলিরা পাশের একটা ঘর থেকে লম্বা কয়টা তক্তা নিয়ে আসে, সারি সারি পেতে দেয়। বলে, এর উপর কম্বল বিছিয়ে শুলে কষ্ট নেই।

সেইমত ব্যবস্থাও হয়। কাল গোমুখ দর্শন করে এখানে ফিরে আবার রাত্রিবাস হবে। তাই মালপত্র এখানেই সব পড়ে থাকবে।

লোকজন এখানে কেউ থাকে না, চৌকিদারও নয়।

জায়গার নাম ভূজবাস (১২,৪৪০ ফিট্)। মানে হয়ত ভূর্জ্জবৃক্ষের বাস। কিন্তু, ভূর্জ্জপত্রের বনও প্রায় শেষ হয়ে এল। এখন চারিদিকেই কঠিন কঠোর পাহাড়, মাথায় সব বরফের চূড়া, তার থেকে এক একটা বরফের ধারা নেমে গঙ্গার কাছে চলে এসেছে। খানিকটা বরফের উপর হেঁটে ধর্ম্মশালায় পেঁছুতে হয়।

ধর্ম্মশালার সামনেই গঙ্গা। ক্ষীণ কায়া, কলোচ্ছলা। তুষার-শীতল জলধারা।

গঙ্গার পরপারে উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণী। তারই তুষারশীর্ষ থেকে বিপুল এক জলধারা সহস্র ধারায় বিচ্ছুরিত হয়ে গঙ্গার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

চারিদিকে যত নির্ঝরিণী সবই জাহ্নবী-জলে নিজেকে বিলিয়ে দিতে ছুটেছে।

রাত্রে গায়ের জামা কাপড় মোজা পরেই কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। প্রচণ্ড শীত।

সঙ্গী সাধুটি মৃদুকণ্ঠে গঙ্গা-স্তব গান করছেন।

'গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি মুরারি-চরণ-চ্যুতম্।
ত্রিপুরারি-শিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্॥'

সেই মধুর সুরের মূর্ছনায় চোখে ঘুমের আবেশ আসে। সারারাত আধ-ঘুমঘোরে কেটে যায়।

১৯

অতি ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠেছি। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে সবাই তৈরি হয়েছি। রাত্রের রাখা রুটি একটা করে চায়ের সঙ্গে খাওয়া হোল।

গতকাল গঙ্গোত্রী থেকে মাইল বারো এসেছি, শুনলাম। মাপা মাইল নয়। অনুমান মাত্র। সরল পথের মাপে হয়ত বারো মাইল হতে পারে, কিন্তু এখানে যেন মনে হয় পঁচিশ-ত্রিশ মাইল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলেও পথ শেষ হতে চায় না। আজও তেমনি মাপে ছয় মাইল মাত্র পথ। যেতে আসতে বারো মাইল। কিন্তু সারাদিন লাগবে এ-পথ অতিক্রম করে ঘুরে আসতে।

এই ভূজবাসে ফিরে এসে আবার রাত্রিবাস। কাল এখান থেকে ভোরে রওনা হয়ে দুপুরের মধ্যেই গঙ্গোত্রী পৌঁছানো যাবে। গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ আসা-যাওয়ার পথে এই একটিমাত্র আশ্রয়স্থল। সঙ্গে তাঁবু আনলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

'গঙ্গামায়ি কি জয়'—ধ্বনি তুলে যাত্রা শুরু হোল।

কখনও গঙ্গার ধারার পাশ দিয়ে, কখনও বা পাহাড়ের কিছু উপর দিয়ে ধীরে ধীরে চলেছি। পথ নেই। পা রাখার স্থানও কোথাও বা অতি সংকীর্ণ। কুলিদের বা পাণ্ডার ছেলের হাত ধরে সে-সব স্থান অতিক্রম করি। বিপদ ঘট্‌লে তারা যে হাতটুকু ধরে আট্‌কে রাখতে পারবে এমন নয়। তবুও হাতের এই সামান্য ভরটুকু দিয়ে সাহসের সেতু বাঁধা হয়। শরীরও ভারসাম্য ফিরে পায়। কিন্তু, ভয় যে সম্পূর্ণ মনের বিকার তা বুঝতে পারি চলার সঙ্গে। চলতে চলতে মনে সাহস জাগে, আত্মনির্ভরতা আসে, হাসিমুখে নির্ভয়ে সংকটময় পথও একাই ক্রমে পার হয়ে এগিয়ে যাই।

গঙ্গার ধারে বালির উপর সব পায়ের চিহ্ন। গাইড্‌ ও কুলিরা দেখেই বলে—ভালুকের পায়ের ছাপ। শুনি, এ-অঞ্চলে বড় বড় ভালুক আছে। সাম্‌নাসাম্‌নি দেখাও যায়। ভাবি, দেখা হলে মন্দ নয়। কিন্তু, দেখা পাই না।

ফেরার পথে, গঙ্গার অপর পারে বড় একদল হরিণ দেখা গিয়েছিল। ঘোড়ার মত প্রকাণ্ড। একটার মাথায় বিরাট্‌ শিঙ্‌। দল বেঁধে চরছিল। আমরা এ-পারে দাঁড়িয়ে দেখছি, ওরাও অপর পারে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে

মত হয়ে তাকিয়ে আছে। আমরাও চলি, তারাও সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। তারপর, হঠাৎ থেমে গিয়ে, যেন বিদায় জানিয়ে, পাহাড়ের উপর উঠে গেল।

ধীরে ধীরে গঙ্গার উৎসমুখে সবাই এগিয়ে চলেছি।

মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি। বিগত-বিষয়-তৃষ্ণ।

জগৎ-সংসার সব ছেড়ে কোথায় যেন আর এক রাজ্যে চলে এসেছি। স্নেহ-মায়া, ভয়-ভাবনা—কোথায় যেন বিলীন হয়েছে। চারিদিকে প্রকৃতির অপার শান্তির মাঝে নিজেকে যেন নিঃশেষ করে দিয়েছি।

পাহাড়ের মাথায় সব বরফ। বরফ গলে কেবলি ঝরণা নেমে এসেছে। কিছু নীচেই গঙ্গার ধারার সঙ্গে মিশ্ছে। ঝরণার বুকে বড় বড় পাথর। সেই সব পাথরের উপর পা রেখে লাফিয়ে লাফিয়ে জলের ধারা পার হচ্ছি। ক্ষীণকায়া ধারাগুলি পার হতে অসুবিধা নেই।

গাইড্ জানায়, বাবুজি, ফেরবার পথে এই সব জায়গাতেই বিপদ। এখন সকালে বরফ গলতে শুরু করে নি।

রৌদ্রের তেজ বাড়লেই দ্রুত গলতে থাকবে, ঝরণার জল বাড়বে, ধারা দশগুণ হয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে নামবে। তখন পার হওয়াই দুষ্কর। জলের ভিতর বড় বড় গোল পাথর গড়িয়ে ফেলে, তারি উপর পা রেখে কোনও রকমে পার হওয়া যায় ত ফেরা—নয়ত, এই সব ঝরণারই ধারে রাত কাটিয়ে আবার ভোরে ফিরতে হয়। দিনের শেষ-ভাগে এ-সব নদী পার হওয়া অসম্ভব।

ভাবি, মিথ্যা এখন ও-সব চিন্তা। অসম্ভব হয়-ই যদি, রাত্রিবাসও করা যাবে। এখন শুধু অভিমন্যুর ব্যূহ-ভেদ হলেও ক্ষতি কি?

হঠাৎ সাম্‌নে পড়ে অপরূপ রূপ!

ঝরণার আশপাশে জল জমে আছে। তারই উপর কাঁচের মত পাত্‌লা বরফ জমেছে। সামান্য স্পর্শেই ভেঙে যায়, জল টল্‌মল্‌ করে উঠে। তার কাছেই পাথরগুলির উপরও বরফের আচ্ছাদন। পাথরের নীচে বরফ গলে ধারা বয়ে চলেছে; উপরের পাথর থেকে বরফের সরু সরু ফালি বটগাছের ঝুরির মত নেমেছে। টপ্‌টপ্‌ করে ফোঁটা ফোঁটা জল মুক্তার মত তা থেকে পড়ছে।

আর, সেই বরফের ঝুরিগুলির উপর সকালের রৌদ্র পড়ে রামধনুর সাতরঙা ছটা ছড়িয়েছে।

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি। কি বিচিত্র বর্ণ-বিন্যাস!

সকাল থেকে প্রায় ছয় ঘণ্টা চলেছি। এখনও ছয় মাইল পথের শেষ হয় নি। অথচ, পথে বিশ্রামও বিশেষ করি নি, ধীরে ধীরে এগিয়েই চলেছি।

গাইড্ বলে, এইবার পেঁাছে গেছি, পাহাড়ের ঐ বাঁকটা ঘুরলেই দর্শন মিলবে।

গঙ্গার দুই কূলের গিরিশ্রেণী কিছু দূরে সরে গেছে। নদীর উপত্যকা প্রসারিত হয়েছে। এ-পারের পাহাড় থেকে ও-পারের পাহাড় প্রায় মাইলখানেক দূর হবে। তারি মধ্যে সাগর-সৈকতের মত বিস্তীর্ণ বালুকারাশির উপর দিয়ে গঙ্গার ধারা নেমে আসছে। সুমুখে উপত্যকার গতি-পথ রোধ করে এক বিরাট গিরিশ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে। তারই দুইটি বরফ-ঢাকা চূড়া সূর্য্য-কিরণে ঝল্‌মল্ করছে। 'শতপন্থ' শিখর। উপত্যকাও তুষারাবৃত। পাহাড়ের উপর থেকে বিরাট 'গ্লাসিয়ার'

নেমে এসেছে। সেই হিম-প্রবাহের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে গাইড্ জানালো, ওরই কাছে গঙ্গার উৎস-মুখ—গোমুখ। বরফের মধ্যে প্রকাণ্ড বরফেরই কয়েকটি গুহা। তারই ভিতর থেকে বরফ গলে গঙ্গা নদীর রূপ ধরে বা'র হয়ে আসছেন—'হিম-বিধু-মুক্তা-ধবল তরঙ্গে'।

জলের কিনারা দিয়ে পাথর ধরে ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। প্রায় আধঘণ্টা চলার পর সেই বরফের গুহার মুখে পেঁছুলাম। সাগরবক্ষ হতে ১৩,৭৭০ ফিট। এর পর সবই তুষার-আচ্ছন্ন। এইখানেই প্রথম নদী-আকারে ভাগীরথীর আবির্ভাব।

ম্যাপ্ খুলে চারিদিকের তুষার-শিখরগুলির নামের সঙ্গে পরিচয় করি।

ভৃগুপন্থ, মেরুপর্ব্বত, শিব্লিঙ্, কীর্ত্তিবাসক, ভাগীরথীপর্ব্বত, শতপন্থ, কালিন্দী, চতুরঙ্গী, বাসুকী-পর্ব্বত, নীলাম্বর, রক্তবরণ, শ্বেতবরণ, সুদর্শন,—অপূর্ব্ব সব নামকরণ। কে কবে এ-সব নাম দিল, তাই ভাবি।

শুভ্র-জটাজুট যোগ-মগ্ন সব যোগীশ্বর। দেবতাত্মা

হিমালয়ে যুগ-যুগান্তরের শাশ্বতবাণীর নির্বাক্ প্রতিমূর্ত্তি।

২০

গোমুখ!

নাম-করণের কারণ খুঁজি। গাভীর মুখ,—হয়ত কবি-চিত্তের কল্পনার কথা। তবুও মনে হয়, সাম্‌নের দুইটি বরফের চূড়ার সঙ্গে গরুর শিঙ্‌-এর সাদৃশ্য এবং বরফের বিরাট গুহাটি মুখ-বিবর মাত্র। আবার মনে হয়,(গো অর্থে পৃথিবীও ত হয়। পৃথিবীর এই তুষার-বিবরই ত এ-নদীর উৎস-মুখ—তা-ই বুঝি বা গো-মুখ।)

বরফের প্রকাণ্ড গুহা। তিন চারশ ফিট্ উঁচু, শতখানেক ফিট্ চওড়া। ভিতরে অন্ধকার। সেই গোপন অন্ধকারের ভিতর থেকে তরল-তরঙ্গে জল বয়ে আসছে। গুহার মুখে বরফের চাঙর ভেঙে ভেঙে পড়ছে, জলের স্রোতে বরফ ভেসে ভেসে চলেছে। বরফ-গলা জল,—নিদারুণ শীতল। জলের রঙ্‌ ঘোলাটে। গঙ্গার গৈরিকবাসের পূর্ব্বাভাষ।

গঙ্গার জলে স্নান করলাম।

সঙ্গে-আনা মেজদাদার অস্থি বিসর্জ্জন দিলাম।

জাহ্নবী-ধারার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখতে থাকি। স্রোতের আবর্ত্তে চিতা-ভস্ম ও অস্থি-খণ্ড নিমিষে কোথায় অন্তর্ধান করে।

ঠিক এক বছর আগেকার কথা। সেদিন এমনি হিমালয়-পথে ঘুরতে ঘুরতে বদরীনারায়ণে এসে পেঁছেছি। পেঁছানোমাত্র পাণ্ডাজি এসে ডাকের চিঠি হাতে দিলেন।

মেজদাদার লেখা। কাশ্মীরে তখন তিনি বন্দী।

লিখেছেন, এ-চিঠি যখন তোমার কাছে পেঁছুবে ততদিনে তুমি হয়ত বদরিকাশ্রমে পেঁছেছ। হিমালয়ের বিরাট ও অপরূপ সৌন্দর্য্য তুমি নিশ্চয় উপভোগ করছ। এখানে আমিও ঐ মহান্ হিমালয়েরই আর এক অংশে আছি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও আছে। শুধু প্রভেদ এই, তুমি স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছ, আর আমার

ঘোরাফেরার হুকুম নেই, স্থানও নেই,—চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী দিবারাত্র পাহারা দিচ্ছে। আমার খুবই ইচ্ছা ছিল, এবার তোমাদের সঙ্গে কেদার-বদরী ঘুরে আসি। কিন্তু, তা ভাগ্যে ছিল না। আগামী বছর ভাগ্য আরও প্রসন্ন হবেন, আশা করি।

এ-চিঠি পাবার দশ দিন পরে কলিকাতায় ফিরে আসি। তার দুই সপ্তাহ পরেই তিনিও ফিরলেন—চির-মুক্তি পেয়ে। কাশ্মীর-সরকার কাশ্মীরী শালে আচ্ছাদন করে তাঁর মর-দেহ ফেরৎ পাঠালেন!

সেদিনই শ্মশানে তাঁর চিতার পাশে বসে সংকল্প করলাম, তাঁর চিতা-ভস্ম ও অস্থি-চূর্ণ নিয়ে আগামী বছর গোমুখে ও বদরিকাশ্রমে ব্রহ্মকপালে বিসর্জ্জন দিয়ে আসব।

আজ বৎসরান্তে সেই উদ্দেশ্য সার্থক হোল।

তাকিয়ে দেখি, গঙ্গার প্রবল প্রবাহে যেন সেই প্রদীপ্ত চিতা-বহ্নিরই লেলিহান্ শিখা। আজ বুঝি বা জননী জাহ্নবীর শান্ত-স্নিগ্ধ স্পর্শে নির্ব্বাপিত হোল।

'সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ।'

*　　　　*　　　　*

জল-ধারার ধারেই এক শীতল শিলাখণ্ডের উপর আসন নিয়েছি। সাম্‌নেই গোমুখ-গুহা।

চারিদিক নিস্তব্ধ নিশ্চল। যোগমগ্ন তুষার-কান্তি জ্যোতির্ম্ময়।

তারি মাঝে জাহ্নবীর জন্ম-কাকলী। সুরধুনীর সুর-ধ্বনি।

ভাগীরথীর মর্ত্ত্যে অবতরণ।

স্থির হয়ে বসি। 'দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে'র অমর মাহাত্ম্য হৃদয়ে উপলব্ধি করি।

চোখের উপর ভেসে ওঠে এই শীর্ণকায়া পর্ব্বত-নির্ঝরিণীর মহীয়সী মহিমা—বিশাল বিস্তৃতি। অঙ্কুরের মাঝে মহীরুহের ইঙ্গিত।

গঙ্গার স্রোতের সঙ্গে মন ভেসে চলে। ছল্‌ছল্‌

কল্‌কল্‌। পাহাড়-পর্ব্বত ভেদ করে ছুটে চলে। যত বাধা, তত বেগ। উচ্ছল উদ্দাম। চারিদিকের গিরি-দেবতা ঝরণার জলের অঞ্জলি দেয়।

জল বাড়ে, স্রোত বয়। পারাবার-বিহারিণী জাহ্নবী ছুটে চলে।

দেবাদিদেব মহাদেবের জটা বেয়ে স্বর্গের নির্ঝরিণী সব কলোচ্ছ্বাসে নেমে আসে। মন্দাকিনী, সরস্বতী, গৌরী, নন্দা, অলকানন্দার সহিত মিলিত হয়ে ছুটে আসে, ভাগীরথীতে নিঃশেষে বিলীন হয়।

মিলনের পুণ্যতীর্থে সঙ্গমে সঙ্গমে প্রয়াগের প্রতিষ্ঠা। পাহাড়ের মাঝেও গঙ্গার উভয়তীরে মানুষের বসতি জাগে। মন্দিরে শঙ্খঘণ্টার রোল ওঠে। গঙ্গার আবাহন জানায়,—পতিতপাবনি সুরধুনি গঙ্গে!

জাহ্নবী ছুটে চলে। পর্ব্বত-কারায় অবরুদ্ধা প্রমত্তা নদী মুক্তির সন্ধানে বেগে ধেয়ে চলে। গিরি-দ্বার ভেদ করে হরিদ্বারে কল্যাণী জননী নেমে আসেন। শ্রান্তি-হরা, শান্তি-ভরা ভীষ্ম-জননী!

ভরা নদী বয়ে চলে। তীরে তীরে কত নগরী, কত তীর্থ গড়ে ওঠে। দুকূলের ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল ফলে।

অন্ন-দায়িনী শান্তি-প্রদায়িনী ভাগীরথী!

কলকল্লোলিনী জাহ্নবী তবু ছুটে চলে। বিশাল বিস্তৃতি—সুগভীর জলরাশি। নৌকা চলে, জাহাজ ভাসে। সভ্যতার পণ্য আসে। যন্ত্র-দানবের বিরাট সৌধ জাগে।

সুধাপ্লাবিতা মকরবাহিনী তবুও ছুটে চলে

জলস্রোতে বিগত বছরের কয়দিনের কাহিনী স্মৃতি-পথে ভেসে আসে।

গঙ্গাসাগর অভিমুখে চলেছি। এই ভাগীরথীরই আর এক রূপ। উচ্ছলা চঞ্চলা পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী নয়—সুবিস্তীর্ণ বারিরাশি। প্রশান্ত বিস্তার। দুই তীরে অভ্রভেদী গিরি-প্রহরী নয়,—সুদূর দিক্‌চক্রবালে তরু-রাজির ঘনসবুজ রেখা। দিগন্ত-প্রসারিণী প্রবাহিনী। সাগর-সঙ্গমে ছুটে চলেছে।

সঙ্গমে মন্দির। তীর্থযাত্রার সমারোহ। লোকমুখে গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন। ভগীরথের কীর্ত্তি, জহ্নুমুনির উপাখ্যান, সগর-রাজের কাহিনী—কত পুণ্য-স্মৃতি-ভরা জাহ্নবী!

মহাসমুদ্র ঊর্ম্মিমালার মুকুট মাথায় হিমালয়ের দুহিতাকে সাদর আহ্বান জানায়। সহস্র তরঙ্গে আলিঙ্গন করে। ভাগীরথীর পুণ্য-প্রবাহ সাগর-জলে বিলীন হয়। মিলনের কল্লোল-কলরব শব্দ-ব্রহ্মের ধ্বনি তোলে।

মহাদ্রি-শিখর হতে মহাসাগর,—বিরাট্ হতে বিশাল। ধ্যান-মগ্ন স্তব্ধ হিমাচলে উৎপত্তি, চির-জাগ্রত উদ্বেল মহা-সমুদ্রে বিলুপ্তি।

বিপুল বিস্ময়ে দেখি, সাগরের বারিকণা মেঘাকারে আকাশ-পথে আবার ছুটে আসে। হিমগিরির হিম-শিখরে তুষার জমে। গিরি-কন্দরে প্রাণের স্পন্দন জাগে, শিব-সুন্দর জটা-শীর্ষে গঙ্গার প্রচণ্ড ধারা বহন করেন, ভগীরথ শঙ্খনাদে আবাহন জানান্। গঙ্গার চিরন্তন মঙ্গলময় যাত্রা আবার চক্রবৎ শুরু হয়।

গোমুখ-বিবর-নিঃসৃতা জাহ্নবীর ছল্‌ছল্‌ উচ্ছল বাণী উঠে; নির্ঝরিণীর সেই কলধ্বনির মাঝে মহাসাগরের মহাকল্লোল প্রতিধ্বনিত হয়।

গোমুখ-কল্লোল মাঝে শুনি আমি সাগর-সঙ্গীত।